Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

মানুষের প্রকৃত সুখ-শান্তি কোথায় অবস্থিত - কুরআন ও হাদিসের আলোকে

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: শারাফাত কারীম

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

তাওহিদা সুলতানা

রোলঃ 23090120646

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

মানুষের প্রকৃত সুখ-শান্তি কোথায় অবস্থিত - কুরআন ও হাদিসের আলোকে

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: শারাফাত কারীম

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

তাওহিদা সুলতানা

রোলঃ 23090120646

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " মানুষের প্রকৃত সুখ-শান্তি কোথায় অবস্থিত - কুরআন ও হাদিসের আলোকে " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে তাওহিদা সুলতানা, আইডিঃ 23090120646 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: শারাফাত কারীম
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ
আকিদাহ ও ফিকহ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " মানুষের প্রকৃত সুখ-শান্তি কোথায় অবস্থিত - কুরআন ও হাদিসের আলোকে " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: শারাফাত কারীম উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

Sultana

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

তাওহিদা সুলতানা

আইডিঃ 23090120646

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

ভূমিকা:	8
সুখী হতে আমাদের কী কী প্রয়োজন?	8
সুখ কী?	10
সুখের প্রকারভেদ:	13
আল্লাহর বড় নিয়ামত:	16
সবর বা ধৈর্য্য:	24
পরকালের আশা:	29
তাওয়াক্কুল বা আল্লাহর ওপর ভরসা:	35
আমলে সালেহ বা সৎকর্ম:	38
মানব জীবনে সুখী হওয়ার জন্য ১৫টি উপায়:	44
দু:খের পর আসে স্বস্তি :	59
ধার্মিক ব্যক্তিরা কি আসলেই বেশি সুখী?	63
মুসলিমের জীবনে অন্যতম বড় নিয়ামত আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন	70
আল্লাহর সন্তুষ্টি বনাম মানুষের সন্তুষ্টি	71

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله

প্রারম্ভিক কথা :

মানুষ সাধারনত ধন - সম্পদ, বিত্ত- বৈভবকে সফলতার চাবি মনে করে।কারো ঐশ্বর্যের পাহাড় দেখে মানুষ মনে করে সে প্রকৃতভাবে সফল এবং সুখী।অথচ পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ রব্বুল আ'লামিন 'সুখ' বলতে কোন শব্দ ব্যবহার করেননি, মানুষ যদি ১৫/২০ বছরও খুঁজে ফেরে এবং না পায় তাহলে ভুল নয় তার। যে সুখ শব্দটি দিয়ে মানুষের মন ও তাদের সমাজ বুঝে- ভোগ, হাসি, আনন্দ, পরিপূর্ণতা, বিলাসিতা, বিনোদন, প্রেমে মত্ত থাকা, জীবনে সবকিছু একদম ঠিকঠাক থাকার এক মানসিক অবস্থা - এর কোন প্রতিশ্রুতি নেই এখানে। বর্তমান প্রেক্ষাপটে সুখ-শান্তি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ধারণা। সবার চাহিদাই তাই। এটা একটা আপেক্ষিক ব্যাপার - বিভিন্ন মানুষ বিভিন্নভাবে সুখবোধ করে থাকে। কেউ কেউ সারারাত ভিডিও গেইমস করে শরীর ও মনকে ক্লান্ত করেও গেইম জিতার আনন্দে সুখ অনুভব করে-যা খুবই ক্ষনস্থায়ী। কেউবা তার পছন্দের কিছু খেতে পেয়ে সুখী বোধ করে বা কেউ চাকুরীর উন্নতিতে সুখ অনুভব করে... এগিলো সবই ক্ষনস্থায়ী - খুব দ্রুত আসে আবার খুব দ্রুতই নি:শেষ হয়ে যায়। মানুষ আবার নতুন করে সুখের সন্ধানে ব্যস্ত হয়ে পরে।

মানুষের জীবনে যদি আকাংক্ষা থাকে শুধু সুখ অর্জন করা তাহলে তা ব্যর্থতাই এনে দিবে এবং হতাশা বাড়িয়ে দিবে। এটা আসলে মানুষের জীবনের সবচেয়ে নিম্নস্তরের সন্ধান বা প্রাপ্তি। অর্থাৎ প্রথমে যদি আসে প্রভাব বিস্তার তাহলে সিরিয়ালি বলা যায়- **প্রভাব বিস্তার> উৎকর্ষতা অর্জন > অর্থ সম্পদ লাভ> জনপ্রিয়তা অর্জন > সামাজিক সম্মান অর্জন > সুখ**- এই দুনিয়াবি প্যারামিটারেও

সুখ সর্ব নিম্নস্তরে অবস্থিত। আল্লাহ রব্বুল ইজ্জত মানুষকে সুখ প্রাপ্তির চেয়ে অনেক বড় বড় নিয়ামত দান করেছেন। যেমন-

সন্তুষ্টি (إشباع /رضاء)

ধৈর্য্য (صبر)

আশা (رجاء) আরো আছে

আল্লাহর দিকে ফিরে যাওয়া (إنابة)

সুখের জীবন দুটি :

ইহলৌকিক ও পারলৌকিক।

ইহলৌকিক জীবনে পরিপূর্ণভাবে অনাবিল সুখ পাওয়া কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। তবে একজন মু'মিন পারলৌকিক সুখকে প্রাধান্য দিয়ে থাকে কেননা তা চিরস্থায়ী ও অনন্ত। মানুষের প্রকৃত সুখ- শান্তি আল্লাহর জিকির ও নেক- আমলের মধ্যে অবস্থিত।যেখানে আল্লাহর স্মরণে অন্তু প্রশান্তি লাভ করে এবং সৎ জীবন যাপন ও পরকালে অনন্ত শান্তির আশা থাকে। আল্লাহর নৈকট্য অর্জন এবং তাঁর হুকুম- আহকসম মেনে চলার মাধ্যমে ইহকাল ও পরকালে শান্তি ও কল্যাণ লাভ করা যায়।

বিভিন্ন বই- পুস্তক পড়ে, এবং বিভিন্ন গুনীজনেরলেখা পড়ে- নিজস্ব অনুসন্ধানের ভিত্তিতে এই লেখাকে সমৃদ্ধ করার প্রয়াস করেছি। উম্মতে মুহাম্মাদির উপকারের নিমিত্তে আল্লা আজ ওয়াজ্জা তা কবুলান মঞ্জুর করুন।

আমি-ন ইয়া রব্বুল আ'লামিন।

ভূমিকা:

আল্লাহ যখন পরম সুখ ও আনন্দের কথা উল্লেখ করেন, তখন তিনি পরকালের সুখের কথা বলেন। তাহলে, এই পার্থিব জীবনের কি সুখের কিছু নেই? বেশ কিছু সহীহ হাদীস, সুন্নাহ, এবং কুরআনের আয়াতেও আমরা এই জীবনের সুখের কথা খুঁজে পাই – যা থেকে অনেক কিছু শিক্ষণীয়ও আছে।

সুখী হতে আমাদের কী কী প্রয়োজন?

মানব সৃষ্টির শুরু থেকেই এই ভাবনা মানুষের মনকে আলোড়িত করেছে। অগণিত দার্শনিক, মনোবিজ্ঞানী, শিল্পী, কবি, গীতিকার এই প্রশ্নের জবাব খুঁজে ফিরেছেন এবং ব্যর্থ হয়েছেন। তাঁদের মধ্য থেকে একজনও আজ পর্যন্ত কোনো পরিপূর্ণ সুখের সংজ্ঞা দিতে পারেননি। একটি বহুল পরিচিত মডেল হলো Maslow's need hierarchy বা চাহিদাভিত্তিক শ্রেণীবিভাগ। এটা মূলত দাবী করে যে, আমাদের চাহিদাগুলো হলো :

১. শরীরবৃত্তিয় চাহিদা (ঘুম, খাবার, বায়ু, পানি ইত্যাদি)

২. নিরাপত্তা (আশ্রয়, আর্থিক নিরাপত্তা, স্বাস্থ্যগত নিরাপত্তা ইত্যাদি)

৩. ভালোবাসা (সমাজ, পরিবার ইত্যাদি)

৪. সম্মান

৫. আত্মমর্যাদাবোধ

৬. আত্মিক উৎকর্ষ (ধর্ম)

যুক্তিসঙ্গতই মনে হচ্ছে, তাই না? Maslow দাবী করেন যে, প্রাথমিক পর্যায়ের চাহিদাগুলো ক্রমান্বয়ে সবগুলো পূরণ হলে তবেই সবশেষ পর্যায়ের আত্মিক সুখ

বা তৃপ্তি লাভ করা সম্ভব হবে। আমরাও কি তা-ই বিশ্বাস করি? এর উত্তর আমরা পবিত্র কুরআনে পেতে পারি।

ইবরাহীম ('আলাইহিসসালাম) তাঁর স্ত্রী হাজেরা ('আলাইহাসসালাম) এবং পুত্র ইসমাঈল ('আলাইহিসসালাম)-কে নির্জন মরু প্রান্তরে একাকী রেখে আসার ঘটনাটি আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন। এই স্থানেই পরবর্তী কালে কাবাঘর নির্মাণ করা হয়। ইবরাহীম ('আলাইহিসসালাম) যখন স্ত্রী-পুত্রকে সেখানে রেখে চলে আসছিলেন, ইবরাহীম ('আলাইহিসসালাম) একটি অসাধারণ দু'আ করেন,

হে আমাদের প্রতিপালক! আমি আমার সন্তানদের একাংশকে শস্যক্ষেতহীন উপত্যকায় তোমার সম্মানিত ঘরের নিকট পুনর্বাসিত করলাম। হে আমার প্রতিপালক! তারা যাতে সালাত কায়িম করে। কাজেই তুমি মানুষের অন্তরকে তাদের প্রতি অনুরাগী করে দাও আর ফল-ফলাদি দিয়ে তাদের জীবিকার ব্যবস্থা কর যাতে তারা শুকরিয়া আদায় করে। [সূরাহ ইবরাহীম (১৪):৩৭]

এই প্রজ্ঞাময় দু'আ থেকে আমরা বুঝতে পারি, মানুষের আসল চাহিদা গুলো কী কী

১. সালাত/ঈমান

২. সমাজ/পরিবার

৩. খাদ্য

Maslow এর চাহিদাভিত্তিক শ্রেণীবিন্যাসের সাথে তুলনা করলে দেখা যায় আসলে তা ঠিক উল্টো।

আল-মিকদাম ইবনুল আসওয়াদ (রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর কসম! আমি নিশ্চয়ই রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি,

যে ব্যক্তি ফিতনা থেকে দূরে থাকবে, সে-ই সুখী; যে লোক ফিতনা থেকে দূরে থাকবে, সে-ই সুখী; যে ফিতনা থেকে দূরে থাকবে, সে-ই সুখী। আর যে ব্যক্তি ফিতনায় পড়ে ধৈর্য ধারণ করবে, তার জন্য কতই না মঙ্গল!

সুখ কী?

জীবন!যেন সুখ-দুঃখের দোলাচলে দোলায়িত এক তরণি। আনন্দ-বেদনা, সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না এখানে আবর্তিত হয় দিনরাত্রির মতো। সুখের সময় আমরা কখনও-বা আনন্দের আতিশয্যে অহংকারী হয়ে উঠি; দুঃখের সময় ভেঙে পড়ি হতাশায়। কিন্তু মুমিনের কাছে এমন অভিব্যক্তি প্রত্যাশিত নয়।
বিশ্বাসী মানুষের রয়েছে সবকিছুর ক্ষেত্রেই পরিমিতিবোধ ও রুচিশীলতা। দুঃখ-কষ্টকেও মুমিন দেখে ভিন্ন চোখে, ভিন্ন অবয়বে। বিশ্বাসী হৃদয়ে রয়েছে সুখ-দুঃখের ব্যতিক্রম তাৎপর্য- হৃদয়ের পটে তার ভিন্ন রং, জীবনের তটে তার ভিন্ন ঢেউ।আল্লাহর রাসূল সা. মুমিনের এই ব্যতিক্রম জীবন-দৃষ্টিকে চিত্রায়িত করেছেন এভাবে-

عَجَبًا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ وَلَيْسَ ذَاكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ

"মুমিনের অভিব্যক্তি বড়োই চমকপ্রদ! সকল অবস্থাই তার জন্য কল্যাণকর। মুমিন ছাড়া আর কারও অবস্থান এমন নয়। সাচ্ছন্দ্যের সময় সে শুকরিয়া করে, ফলে তা তার জন্য কল্যাণময় হয়। আর কষ্টে পড়লে সে সবর করে, ফলে তাও তার জন্য কল্যাণকর হয়ে ওঠে।" মুসলিম: ৭২২৯

যার ঈমান যত সুদৃঢ়, তিনি তত সৌন্দর্যের সাথে দুঃখ-কষ্টকে মোকাবিলা করেন। বিপদ-মুসিবতকে তিনি মনে করেন গোনাহ মাফের উপলক্ষ্য। দুঃখ-

কষ্টকে নেন সবরের সুযোগ হিসেবে। এভাবে আল্লাহর পরীক্ষায় মুমিন উতরে যান এবং নিজের মর্যাদাকে আরও বুলন্দ করে নেন।

সুখ হলো পরিতোষ, প্রেম, পূর্ণতা, পুলক, উল্লাস, আহ্লাদ ইত্যাদির একক, একাধিক বা সম্মিলিত অনুভূতি।

মানসিক অবস্থা:

এটি মনের এমন একটি অবস্থা যেখানে একজন ব্যক্তি জীবন নিয়ে **সন্তুষ্ট** থাকেন এবং **ইতিবাচক আবেগ** অনুভব করেন।

ব্যক্তিগত অনুভব:

সুখ সম্পূর্ণভাবে ব্যক্তিগত এবং একে সঠিকভাবে পরিমাপ করা কঠিন।

প্রাচীন দার্শনিক থেকে শুরু করে আধুনিক মনোবিজ্ঞানীরা সুখকে বিভিন্ন দিক থেকে সংজ্ঞায়িত করার চেষ্টা করেছেন। মনোবিজ্ঞান বিশেষজ্ঞরা সুখকে **ইতিবাচক কর্ম ও আবেগসমূহের সমষ্টি** হিসেবে বিবেচনা করেন।

ইসলামে 100 % সুখকে 'রিদাহ বাই আল-কাদাহ' বলা হয় (ভাগ্যে যা আছে তাই নিয়ে সন্তুষ্ট থাকা)। এর অর্থ হল ইমানদার হওয়া যদি আমরা সত্যিই আল্লাহকে ভালবাসি এবং তার উপরে নির্ভর করি। আমাদের জন্য তিনি যা আদেশ করেছেন তা নিয়ে যেন আমরা সন্তুষ্ট থাকি । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তিনি আমাদের ভাগ্য নিয়ে কথা বলবেন এবং সন্তুষ্টির গুরুত্ব তুলে ধরবেন । অতএব আমাদেরও এই অনুরোধগুলো পড়ার প্রচেষ্টা করা উচিত:

"আমি আল্লাহকে আমার পালনকর্তা হিসাবে পেয়ে খুশি হয়েছি, আমার ধর্ম হিসাবে ইসলামের সাথে এবং মুহাম্মদকে (তার উপর শান্তি ও আশীর্বাদ) আমার নবী হিসাবে পেয়ে " [আবু দাউদ]। "হে আল্লাহ্, আমাকে যা দিয়েছ তা দিয়ে আমাকে

সন্তুষ্ট করে দাও, আমার জন্য আশীর্বাদ পাঠাও, এবং আমার জন্য প্রত্যেকটি অনুপস্থিত জিনিসের মধ্য দিয়ে ভাল কিছু রাখো"। [বুখারী]

সুখের প্রকারভেদ:

সুখ প্রধানত দুই প্রকার:

১. **হেডোনিক সুখ** (ক্ষণস্থায়ী, তাৎক্ষণিক আনন্দ) এবং

২. ইউডাইমোনিক সুখ (দীর্ঘমেয়াদী, গভীর তৃপ্তি)।

- **হেডোনিক সুখ: দুনিয়াবি সুখ এটাই।**
  - এটি একটি স্বল্পমেয়াদী এবং তাৎক্ষণিক আনন্দদায়ক অনুভূতি।
  - এটি মূলত বাহ্যিক উৎস থেকে আসে, যেমন ভালো খাবার, কেনাকাটা বা অন্য কোনো বিনোদনমূলক কাজ।
  - এটি দ্রুত আসে এবং দ্রুত চলে যায়।
- **ইউডাইমোনিক সুখ: এটা পারলৌকিক সুখ। যা আল্লাহ আজওয়াজ্জা প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।**
  - এটি একটি দীর্ঘমেয়াদী এবং গভীর সন্তুষ্টিদায়ক অনুভূতি।
  - এটি জীবনকে অর্থপূর্ণ করে তোলা, ব্যক্তিগত বিকাশ, লক্ষ্য অর্জন এবং অন্যের সাথে গভীর সম্পর্ক তৈরির মাধ্যমে অর্জিত হয়।
  - এই ধরনের সুখকে প্রায়শই 'প্রকৃত' বা 'গভীর' সুখ হিসেবে উল্লেখ করা হয়।

আবদুল হামিদ মাদানী তার "সুখের সন্ধানে" বইয়ে সুখের বিভিন্নতা বিশদভাবে লিখেছেন। তার কিছুটা ধারাবাহিকভাবে বর্ননা করা প্রয়োজন। যেমন-

মিথ্যা সুখ:

পার্থিব কিছু সুখ আছে যা আসলে ভুয়ো ও মিথ্যা। অপরের দৃষ্টিতেও এ সুখের সুখীকে প্রকৃত সুখী বলে মনে হয় যে, সেটাই জীবনের চরম সাফল্য। কিন্তু বাস্তব তার বিপরীত।

ধন সুখ:

অনেকে বিত্ত- বৈভব, ধন সম্পদ সম্পন্ন ব্যক্তিদের সুখী মনে করে। পক্ষান্তরে দেখা যায় সে সম্পদ আহরণে ব্যস্ত থেকে পরিবারের সাথে সুহৃদ হতে পারে না। উপরন্ত সম্পদ হারানোর ভয়ে থাকে সদা ভীত।কিয়ামতের দিন বড় বড় ধনীরা যখন আল্লাহর আযাব দেখে নিরাশ হয়ে যাবে তখন তারা আফসোস করে বলবে, "আমার মাল আমার কোন উপকারে আসল না।" (সুরাহ হাক্কাহ ২৮ নং আয়াত) বলাই বাহুল্য যে, যে ধন দ্বারা ধনী উপকৃত হতে পারে না, সে ধনে সুখ কিসের? ধন-সম্পদে সুখ নয়, মনে সুখ। ধন থেকে নিধন হলেও মানুষের মন থেকে সুখ যায় না। এমনও লোক আছে, যারা ধনী নয়। তবুও বড় সুখী। আসলে ধনের চাইতে মান বড়। অতএব আমরা ধন-সম্পদের এ কৃত্রিম সুখকে আসল সুখ মনে করবো না। আসলে যার মন ধনী, সেই প্রকৃত ধনী। নচেৎ সারা পৃথিবী পেয়েও তার ধন-পিপাসা মিটবে না। ধনী হয়েও নিজেকে সে দরিদ্র মনে করবে। তাছাড়া একজন দরিদ্র লোক যত বেশী নিশ্চিন্ত, একজন রাজা তত বেশী উদগ্রীব। আর ধনী লোকের ধন তার স্বাস্থ্যের পক্ষে বড় শত্রু। আর ভালো স্বাস্থ্যের চেয়ে সম্পদ বেশী মুল্যবান নয়। তাহলে ধনী হয়ে সুখ কোথায়? ধনের বর্ধনশীল লোভ মানুষের মনুষ্যত্বকেও নষ্ট করে ফেলে অনেক সময়- সে হারাম হালালের পার্থক্য তালাশ করা ছেড়ে দেয়। এবং বিপথগামী হয়ে গোমরাহীতে নিমজ্জিত হয়।

দুনিয়ার জীবনের দারিদ্র্য বা ঐশ্বর্য আল্লাহ তায়ালার নিকট মকবূল ও বিতাড়িত হওয়ার মাপকাঠি হতে পারে না। অনেক মকবূল বান্দা পরীক্ষাস্বরুপ দুনিয়াতে অভাবের জীবন যাপন করে থাকেন।আর হতভাগা পাপীদের ঢিল দেয়া হয়- ওরা ভেগ বিলাসে মেতে থাকে। এ-ই প্রমান করে যে, এ জীবনের পর আর একটি জীবন আছে, সেখানে প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার নেক ও বদ আমলের ওপর পরিপূর্ণ ফল অবশ্যই দেওয়া হবে।

খ্যাতি সুখ:

অনেকে মনে করে যে যারা খ্যাতনামা তারা অবশ্যই সুখী মানুষ। কিন্তু এমন ধারণা ভুল। কারণ, যে খ্যাতির সাথে আল্লাহর তাকওয়া বিজড়িত থাকে না, সে খ্যাতি সুখ্যাতি নয়। পরন্ত আল্লাহর মুত্তাকী বান্দা মানুষের কাছে খ্যাতি ও লোক মাঝে প্রসিদ্ধি কামনা করে না। যেহেতু মহান আল্লাহ মুত্তাকী ধনী ও সেই সাথে গুপ্ত বান্দাকে ভালোবাসেন। (মুসলিম ২৯৬৫) তাছাড়া যে খ্যাতির সাথে অকৃত্রিম ভিত্তি যুক্ত নয়, সে খ্যাতি অতি সত্তর অপসারিত হয়। আর খ্যাতি অপসারিত হলেই, খ্যাতি-লোভী মানুষের জীবন থেকে সর্বসুখ বিলীন হয়ে যায়। অনেক দুনিয়াদার মানুষ তাদের সংকীর্ণ দৃষ্টিকোণে মনে করে যে, একজন খেলোয়াড় যখন বিশ্বকাপে খ্যাতি অর্জন করে সারা বিশ্বে সুনাম ও বড় সুখোজ্জ্বল ও তৃপ্তিময় প্রসিদ্ধি অর্জন করে, তখন তার জীবন হয় বিখ্যাত। কিন্তু এমন ধারণা ভ্রান্ত। যেহেতু অধিকাংশ খেলোয়াড়ই মানসিক কোন না কোন পীড়া নিয়ে কালাতিপাত করে। কেউ তো সফরের পর সফর করে, স্ত্রী-সন্তান হতে দুরে থেকে, খেলার সময় বিরোধী টিমের কাছে হার-জিতের টেনসন নিয়ে, আর হারার পর মানসিক পরাজয় নিয়ে কে আর সুখের আস্বাদন পায়? তেমনি দুনিয়া খ্যাত নামি দামী সেলিব্রিটিরাও একদিন পানি না পাওয়া গাছের মতো মুষড়ে পরে।

পদ সুখ:

রাজত্ব, মন্ত্রিত্ব, নেতৃত্ব এ সব কিছুই যদিও মানুষের জন্য লোভনীয় ও শোভনীয় সুখের জীবন, তবুও তাতে প্রকৃত সুখ নেই। আর এ কথা বিশেষ করে তারা জানে, যারা গণতান্ত্রিক দেশে বাস করে। রাজনৈতিক টানাপোড়েনের মাঝে অনেক সময় নেতৃত্ব হাতছাড়া অথবা বিরোধী দলের হাতে খুন হওয়ার যে একটা আশঙ্কা ও দুশ্চিন্তা নেতাদের থাকে, তাতেই বুঝা যায় নেতারা কত সুখী। আর ভোটের মারকলে গদি উল্টে গেলে তো সুখের স্বপ্নই ভেঙ্গে যায় তাদের। বিভিন্ন দেশের রাজা-মন্ত্রীদের উত্থান-পতনের ইতিহাস পড়লে ও শুনলে আমরা সে কথা

স্পষ্টভাবে বুঝতে পারি। আজকের পদ মর্যাদা হয়তো কাল কাল হয়ে দাঁড়াবে। এমন অনেক উদাহরণ আমাদের সামনে অহরহ আসছে যা অনস্বীকার্য।

নারী স্বাধিনতায় মহিলার সুখ:

অনেকে ধারণা করে যে, নারী-স্বাধীনতায় তার চরম সুখ রয়েছে। কিন্তু অন্য এক শ্রেণীর মহিলার মতে তথাকথিত নারী স্বাধীনতায় কোন সুখ নেই। বরং তাতে নারীর কষ্টই আছে। নারীর শান্তি হল স্বামীর অধীনে চলে পবিত্র সংসার করায়। সেই পরাধীনতায় আছে, চরম তৃপ্তি, পরম আনন্দ। মুরগীর কোল ছেড়ে যেমন ডিম ঘোলা হয়ে যায়, তেমনি নারী স্বামীর আদেশ-অনুমতির বাইরে গেলে নষ্ট হয়ে যায়, কষ্ট পায়। স্বাধীনতায় আনন্দ আছে, সুখ নেই। বিশ্বের সবচেয়ে বড় ধনকুবের মহিলা ক্রিষ্টিনা স্বাধীনতায় কোন সুখ পায় নি। অন্য কোন মহিলাও পেতে পারে না।বরং ইসলামে নারীর যে মর্যাদা দিয়েছে তাতে সন্তুষ্টচিত্তে জীবনযাপন করা অনেক নিরাপদ ও পবিত্র। এতেই রয়েছে সাফল্য ও শান্তি।

আল্লাহর বড় নিয়ামত:

ঈমান :

ঈমান একটি আরবি শব্দ। শব্দটির মূল অর্থ বিশ্বাস করা, স্বীকৃতি দেয়া এবং বিশ্বস্ততা বা হৃদয়ের স্থিতি। এছাড়াও আনুগত্য করা, অবনত হওয়া, নির্ভর করা, স্বীকৃতি দেয়া অর্থেও শব্দটি ব্যবহৃত হয়।

মূলত ঈমান হচ্ছে স্বীকারোক্তি এবং আমলের নাম। অর্থাৎ অন্তর ও জবানের স্বীকারোক্তি এবং অন্তর, জবান ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কর্মকে ঈমান বলা হয়।

ঈমানের মূল পরিচয় একটি হাদিসে সহজভাবে বিবৃত হয়েছে। আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেছেন, একবার হজরত জীবরাঈল (সা.) মানুষের বেশে রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সামনে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, ‘ঈমান কী? তিনি উত্তরে

বলেন, আল্লাহর প্রতি, তাঁর ফেরেশতাগণের প্রতি, তাঁর পুস্তকগুলো (আসমানী কিতাব), তাঁর সাক্ষাতে, তাঁর রাসুলদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা এবং শেষ দিবসে পুনরুত্থান ও তাকদিরের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন। (বুখারি হাদিস)
এ হাদিস থেকে বুঝা যায়,ছয়টি বিশ্বাসের উপর ঈমান প্রতিষ্ঠিত-

১. আল্লাহ

২. ফেরেশতাগণ

৩. আসমানী কিতাবসমূহ

৪. রসূলগণ,

৫. শেষ দিবস এবং

৬. ভাগ্যের ভাল-মন্দের প্রতি ঈমান আনা।

ইমাম আবু হানিফা (র.) বলেছেন, ‘ইমান হচ্ছে অন্তরের সত্যায়ন ও মুখের স্বীকৃতি।’
ইমাম শাফেয়ি, মালেক ও আহমদ ইবনে হাম্বল (র.)-র মতে, ‘অন্তরের বিশ্বাস, মৌখিক স্বীকৃতি এবং আমলে বাস্তবায়ন করার নাম ইমান।’
আর ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায়,অন্তরে বিশ্বাস করা, জবান দ্বারা স্বীকৃতি দেয়া এবং সে মোতাবেক কাজে বাস্তবায়ন করার নাম ঈমান।
মুখে কালিমা পড়ে এর বিষয়বস্তু অন্তরে বিশ্বাস করে বাস্তবে আমল করার মাধ্যমে ঈমান পূর্ণতা লাভ করে। কালিমা গ্রহনযোগ্য হওয়ার শর্ত হলো-

১. ইখলাসের সাথে উচ্চারণ করা।

২. কালিমার অর্থ জানা এবং তা সত্যায়ন করা।

৩. অন্তরে নিশ্চিত বিশ্বাস রাখা।

৪. কালিমার অনুসারীদের প্রতি ভালবাসা রাখা।

৫. কালিমার দাবীসমূহ পরিপূর্ণ আনুগত্য ও নিষ্ঠার সাথে পালন করা।

৬. কালিমার দাবীর বিপরীত বিষয়কে বর্জন করা।

শুধুমাত্র ধন-সম্পদ বা পার্থিব সফলতা প্রকৃত সুখ নয়; ঈমান ও সৎকর্মই আসল সফলতা, যেমনটি কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে।

ঈমান কল্যাণ ও সমৃদ্ধির চাবিকাঠি:

আল্লাহ রব্বুল আ'লামিন ইরশাদ করেছেন- আল-আরাফ : আয়াত ৯৬

وَ لَوۡ اَنَّ اَہۡلَ الۡقُرٰۤی اٰمَنُوۡا وَ اتَّقَوۡا لَفَتَحۡنَا عَلَیۡہِمۡ بَرَکٰتٍ مِّنَ السَّمَآءِ وَ الۡاَرۡضِ وَ لٰکِنۡ کَذَّبُوۡا فَاَخَذۡنٰہُمۡ بِمَا کَانُوۡا یَکۡسِبُوۡنَ۹۶﴿

অর্থ : আর যদি জনপদসমূহের অধিবাসীরা ঈমান আনত এবং তাকওয়া অবলম্বন করত তাহলে আমি অবশ্যই আসমান ও যমীন থেকে বরকতসমূহ তাদের উপর খুলে দিতাম; কিন্তু তারা অস্বীকার করল। অতঃপর তারা যা অর্জন করত তার কারণে আমি তাদেরকে পাকড়াও করলাম।

ঈমান শাস্তি থেকে বাঁচার জন্য অন্যতম উপায়:

আল্লাহ বলেছেন- নিসা : (আয়াত ১৪৭)

مَا یَفۡعَلُ اللّٰہُ بِعَذَابِکُمۡ اِنۡ شَکَرۡتُمۡ وَ اٰمَنۡتُمۡ ؕ وَ کَانَ اللّٰہُ شَاکِرًا عَلِیۡمًا۱۴۷﴿

অর্থ : যদি তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর এবং ঈমান আন তাহলে তোমাদেরকে আযাব দিয়ে আল্লাহ কী করবেন? আল্লাহ পুরস্কার দানকারী, সর্বজ্ঞ।

অর্থাৎ আল্লাহর কৃতজ্ঞতা করার অর্থ হল, তাঁর নির্দেশ অনুযায়ী অন্যায়-অনাচার থেকে বিরত থাকা এবং নেক আমলের প্রতি যত্ন নেওয়া। এটাই হল আল্লাহর নিয়ামতের কার্যতঃ কৃতজ্ঞতা। আর ঈমান (বিশ্বাস) বলতে আল্লাহর তাওহীদ (একত্ব), তাঁর রুবূবিয়্যাত (প্রতিপালকত্ব) এবং শেষ নবী মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর

রিসালাত এবং অন্যান্য দ্বীনী বিষয়ের উপর বিশ্বাস স্থাপন করা। যে তাঁর (আল্লাহর) কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে, তিনি তার মূল্যায়ন করবেন। যে অন্তর থেকে ঈমান আনবে, তিনি তাকে জেনে নেবেন এবং সেই অনুযায়ী তাকে উত্তম প্রতিদানও দেবেন।

কুরআন ঈমানের পরিচয় দেয় এবং কুরআন পাঠ করলে ঈমান বৃদ্ধি পায়:

আল্লাহ আযওয়াজ্জা উল্লেখ করেছেন- আল-আনফাল : আয়াত ২

اِنَّمَا الۡمُؤۡمِنُوۡنَ الَّذِيۡنَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتۡ قُلُوۡبُهُمۡ وَ اِذَا تُلِيَتۡ عَلَيۡهِمۡ اٰيٰتُهٗ زَادَتۡهُمۡ اِيۡمَانًا وَّ عَلٰى رَبِّهِمۡ يَتَوَكَّلُوۡنَ۲ۚۖ

অর্থ : মুমিন তো তারা, যাদের অন্তরসমূহ কেঁপে উঠে যখন আল্লাহকে স্মরণ করা হয়। আর যখন তাদের উপর তাঁর আয়াতসমূহ পাঠ করা হয় তখন তা তাদের ঈমান বৃদ্ধি করে এবং যারা তাদের রবের উপরই ভরসা করে।

এই আয়াতে ঈমানদারদের চারটি গুণের কথা উল্লেখ করা হয়েছেঃ

(ক) তারা আল্লাহ ও তদীয় রসূলের আনুগত্য করে; কেবল আল্লাহর অর্থাৎ, কুরআনের আনুগত্য নয়।

(খ) আল্লাহর স্মরণের সময় আল্লাহর মহত্ত্বে তাদের অন্তর কেঁপে ওঠে।

(গ) কুরআন পাঠ করলে তাদের ঈমান বৃদ্ধি পায়। (যার দ্বারা বুঝা যায়, ঈমান কম-বেশি হয়; যেমন মুহাদ্দিসগণের অভিমত।)

(ঘ) তারা নিজ প্রভু (আল্লাহর) উপর ভরসা করে। ভরসা করার অর্থ যথাসাধ্য বাহ্যিক সকল উপায়-উপকরণ অবলম্বন করার পর আল্লাহর উপর ভরসা করা। অর্থাৎ, বাহ্যিক উপায় অবলম্বন পরিহার করে না, কারণ তা অবলম্বন করার আদেশ মহান আল্লাহই দিয়েছেন। তবে বাহ্যিক উপায়কেই তারা সব কিছু মনে করে না; বরং তাদের দৃঢ়-বিশ্বাস যে, আসলে সকল কর্ম আল্লাহর ইচ্ছাতেই সম্পন্ন হয়। অতএব যতক্ষণ আল্লাহর ইচ্ছা না হবে, ততক্ষণ বাহ্যিক উপায়

অবলম্বন কোনই কাজে আসবে না। আর এই দৃঢ়-বিশ্বাস ও ভরসার কারণে আল্লাহর সাহায্য চাওয়া হতে এক পলও গাফেল থাকে না। পরবর্তীতে আরো কিছু গুণের কথা বর্ণনা করা হচ্ছে। এই সকল গুণের অধিকারীদেরকে মহান আল্লাহ প্রকৃত মু'মিন গণ্য করেছেন এবং ক্ষমা, দয়া ও উত্তম জীবনোপকরণের সুসংবাদ দিয়েছেন। (আল্লাহ আমাদেরকে যেন তাদের দলভুক্ত করেন।) বদর যুদ্ধের প্রেক্ষাপটঃ- বদর যুদ্ধ হিজরী দ্বিতীয় সনে সংঘটিত হয়। এটি কাফেরদের সাথে প্রথম যুদ্ধ। এ ছাড়া এ যুদ্ধের কোন পরিকল্পনা ছিল না; বরং তা হঠাৎ সংঘটিত হয়ে যায়। যোদ্ধা ও যুদ্ধাস্ত্র অল্প থাকার কারণে কোন কোন মুসলিম মানসিকভাবে প্রস্তুতও ছিলেন না। এর প্রেক্ষাপট ছিল এরূপ যে, আবু সুফিয়ান (যিনি তখনও ইসলাম গ্রহণ করেননি) এর নেতৃত্বে একটি বাণিজ্য কাফেলা শাম হতে মক্কায় ফিরছিল। এদিকে মুসলিমদের হিজরত করার ফলে তাদের ধন-সম্পদ মক্কায় থেকে গিয়েছিল বা কাফেররা ছিনিয়ে নিয়েছিল। সেই সাথে মক্কার কাফেরদের শক্তি ভেঙ্গে দেওয়াও ছিল সময়ের দাবী। উক্ত সকল কারণে রসূল (সাঃ) বাণিজ্য কাফেলার উপর আক্রমণ করার পরিকল্পনা করেন এবং এই উদ্দেশ্যে মুসলিমগণ মদীনা ত্যাগ করেন। আবূ সুফিয়ানের নিকট এই সংবাদ পৌঁছে যায়। সুতরাং তিনি রাস্তা পরিবর্তন করে ফেলেন এবং মক্কায় এ সংবাদ পৌঁছে দেন। যার ফলে আবূ জাহল একটি সেনাদল নিয়ে কাফেলার হিফাযতের জন্য বদরের দিকে রওনা হয়। যখন নবী (সাঃ) এই পরিস্থিতি জানতে পারেন তখন তা সাহাবাদের নিকট খুলে বলেন। সেই সাথে আল্লাহর প্রতিশ্রুতির কথাও ব্যক্ত করেন যে, (বাণিজ্য কাফেলা অথবা সেনাদল) এই দুয়ের মধ্যে একটির সাক্ষাৎ পাবে। তবুও কিছু সাহাবী যুদ্ধের ব্যাপারে দ্বিধা প্রকাশ করে বাণিজ্য কাফেলার পিছু নেওয়ার পরামর্শ দিলেন। পক্ষান্তরে অন্যান্য সাহাবীগণ রসূল (সাঃ) সাথে থেকে যুদ্ধে পরিপূর্ণ সাহায্য-সহযোগিতা করার আশ্বাস দিলেন। এই প্রেক্ষিতেই উক্ত আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হয়।

আল্লাহর স্মরণ:

আল্লাহর স্মরণ বা যিকরুল্লাহ সর্বাবস্থায় একান্ত কাম্য। আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন- আল-আহযাব : আয়াত ৪১

يٰۤاَيُّهَاالَّذِيۡنَ اٰمَنُوا اذۡكُرُوا اللّٰهَ ذِكۡرًا كَثِيۡرًا﴿۴۱

অর্থ : হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহকে অধিক পরিমাণে স্মরণ করো।

আল্লাহ পাক নির্দেশ দিয়েছেন সকাল - সন্ধ্যায় তাঁর যিকির করতে এমনকি দাওয়াতি কাজের সময়ও। অন্তরকে সদা সর্বদা যিকিরে শিক্ত রাখতে হবে। সুরা আন- নিসার ১০৩ নং আয়াতে আল্লাহ বলেছেন-

فَاِذَا قَضَيۡتُمُ الصَّلٰوةَ فَاذۡكُرُوا اللّٰهَ قِيٰمًا وَّ قُعُوۡدًا وَّ عَلٰى جُنُوۡبِكُمۡ ۚ فَاِذَا اطۡمَاۡنَنۡتُمۡ فَاَقِيۡمُوا الصَّلٰوةَ ۚ اِنَّ الصَّلٰوةَ كَانَتۡ عَلَى الۡمُؤۡمِنِيۡنَ كِتٰبًا مَّوۡقُوۡتًا﴿۱۰۳

অর্থ : অতঃপর যখন তোমরা সালাত পূর্ণ করবে তখন দাঁড়ানো, বসা ও শোয়া অবস্থায় আল্লাহর স্মরণ করবে। অতঃপর যখন নিশ্চিন্ত হবে তখন সালাত (পূর্বের নিয়মে) কায়েম করবে। নিশ্চয় সালাত মুমিনদের উপর নির্দিষ্ট সময়ে ফরয।

উক্ত ভয়ের নামাযকেই বুঝানো হয়েছে। এ নামাযকে যেহেতু কমিয়ে হালকা করে দেওয়া হয়েছে তাই এই ঘাটতি পূরণের জন্য বলা হচ্ছে যে, দাঁড়িয়ে, বসে ও শায়িত অবস্থায় আল্লাহর যিকর করতে থেকো। ভয় ও যুদ্ধ-অবস্থার পরিসমাপ্তি ঘটলে, নামাযকে তার পূর্বের নিয়মে পড়বে যেভাবে স্বাভাবিক অবস্থায় পড়া হয়। এতে নামাযকে তার যথানির্ধারিত সময়ে পড়ার তাকীদ করা হয়েছে। এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, কোন শরয়ী ওজর ছাড়া দুই নামাযকে একত্রে (জমা করে) পড়া শুদ্ধ নয়। কেননা, (একত্রে পড়লে) কম-সে কম একটি নামাযকে তার সময় ছাড়াই পড়া হবে যা এই আয়াতের পরিপন্থী।

যিকিরের উপকারিতা :

"জেনে রাখ, আল্লাহর স্মরণে হৃদয় প্রশান্ত হয়" (সূরা আর-রাদ, আয়াত ২৮)। নামাজ, কোরআন তিলাওয়াত, দোয়া, ও জিকিরের মাধ্যমে আল্লাহকে স্মরণ করা হলে অন্তরে প্রশান্তি আসে। যারা আল্লাহ অভিমূখী হয় তারা ঈমানের দৌলত লাভ করে থাকে এবং যিকরুল্লাহ (আল্লাহর স্মরণ) দ্বারা মু'মিনের শরীর ও অন্তর শান্ত হয় ও স্বস্তি হাসিল করে। কেননা, সর্বাপেক্ষা বড় যিকর তো কুরআন,যা পাঠ তাদের দিলে ঈমানের ভিত পয়দা হয়, দ্বিধা- সন্দেহ ও শয়তানী ওয়াসওয়াসা দূরীভূত হয়ে স্থিরতা ও স্বস্তি লাভ হয়। আল্লাহকে স্মরণ করলে তিনিও বান্দাদের স্মরণ করেন। যেমনটা মালিক আল্লাহ বলেছেন, " অতএব তোমরা আমাকে স্মরণ করো, তাহলে আমিও তোমাদেরকে স্মরণ করবো" - (সুরা বাক্বারা আয়াত: ১৫২)।

সাহাবাদের কোন কাজই আল্লাহর স্মরণে বাঁধা হতো না। সুরাহ নূরের ৩৭ নং আয়াতে আল্লাহ বলেছেন-

رِجَالٌ ۙ لَّا تُلۡهِيۡهِمۡ تِجَارَةٌ وَّ لَا بَيۡعٌ عَنۡ ذِكۡرِ اللّٰهِ وَ اِقَامِ الصَّلٰوةِ وَ اِيۡتَآءِ الزَّكٰوةِ ۪ۙ
يَخَافُوۡنَ يَوۡمًا تَتَقَلَّبُ فِيۡهِ الۡقُلُوۡبُ وَ الۡاَبۡصَارُ ٭ۙ ۳۷﴿

অর্থ : সেসব লোক, যাদেরকে ব্যবসা-বাণিজ্য ও ক্রয়-বিক্রয় আল্লাহর যিকর, সালাত কায়েম করা ও যাকাত প্রদান করা থেকে বিরত রাখে না। তারা সেদিনকে ভয় করে, যেদিন অন্তর ও দৃষ্টিসমূহ উল্টে যাবে।

এ থেকে দলিল গ্রহন করে বলা হয়েছে যে, যদিও সাধারন পোশাককে বিনা সুগন্ধি মেখে, পর্দা সহকারে মেয়েরা মসজিদে যেতে পারে; যেমন আল্লাহর রাসুল (সাঃ) এর যুগে মেয়েরা মসজিদে নববীতে গিয়ে নামায আদায় করত, তবুও ওদের জন্য নিজ নিজ ঘরে নামায আদায় করাই অধিক উত্তম। হাদিসেও এ কথাকে স্পষ্ট করা হয়েছে। (আবু দাউদঃ নামায অধ্যায়, আহমাদ ৬/২৯৭, ৩০১)

وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ অত্যন্ত ভয়ে ঘাবড়ে যাওয়ার কারণে। যেমন অন্যত্রে বলা হয়েছে, { الْآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ}

অর্থাৎ, ওদেরকে আসন্ন দিন সম্পর্কে সতর্ক করে দাও, যখন দুঃখে-কষ্টে ওদের প্রাণ কণ্ঠাগত হবে। " (সূরা মু'মিন ৪০:১৮ আয়াত) প্রাথমিকভাবে সকলের অন্তরের অবস্থা এ রকম হবে; চাহে মু'মিন হোক বা কাফের।

তাসবীহ পাঠের মাধ্যমেও আল্লাহর স্মরণ করা উত্তম। সুরাহ আলে ইমরান এর ৪১ নং আয়াতে আল্লাহ নির্দেশ করেন- " সকাল ও সন্ধ্যায় তাসবীহ পাঠ করো।" ঘুম থেকে উঠার পর থেকেই তাসবীহ পাঠের আদেশ রয়েছে-

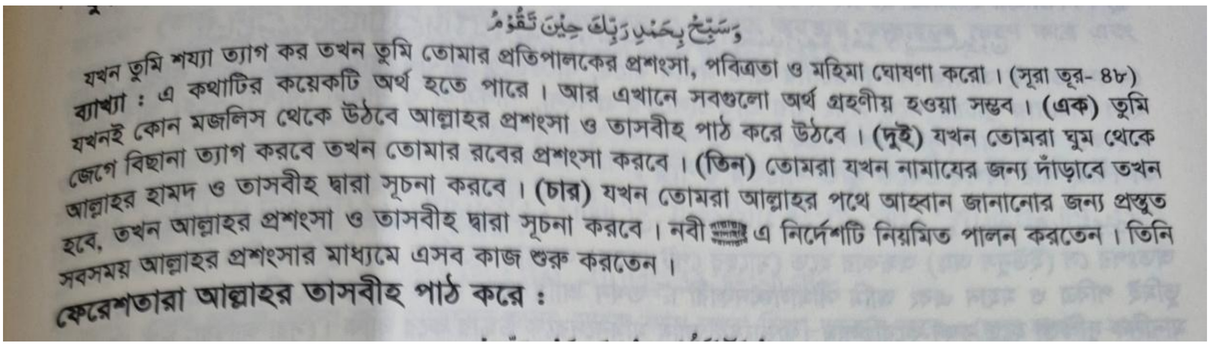

وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ

যখন তুমি শয্যা ত্যাগ কর তখন তুমি তোমার প্রতিপালকের প্রশংসা, পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করো। (সূরা তূর- ৪৮)

ব্যাখ্যা : এ কথাটির কয়েকটি অর্থ হতে পারে। আর এখানে সবগুলো অর্থ গ্রহণীয় হওয়া সম্ভব। **(এক)** তুমি যখনই কোন মজলিস থেকে উঠবে আল্লাহর প্রশংসা ও তাসবীহ পাঠ করে উঠবে। **(দুই)** যখন তোমরা ঘুম থেকে জেগে বিছানা ত্যাগ করবে তখন তোমার রবের প্রশংসা করবে। **(তিন)** তোমরা যখন নামাযের জন্য দাঁড়াবে তখন আল্লাহর হামদ ও তাসবীহ দ্বারা সূচনা করবে। **(চার)** যখন তোমরা আল্লাহর পথে আহ্বান জানানোর জন্য প্রস্তুত হবে, তখন আল্লাহর প্রশংসা ও তাসবীহ দ্বারা সূচনা করবে। নবী ﷺ এ নির্দেশটি নিয়মিত পালন করতেন। তিনি সবসময় আল্লাহর প্রশংসার মাধ্যমে এসব কাজ শুরু করতেন।

ফেরেশতারা আল্লাহর তাসবীহ পাঠ করে :

সবর বা ধৈর্য্য:

পরকালে বিনিময় নেওয়ার জন্য ঈমানের সাথে শর্ত হল দুটি; ধৈর্য এবং সওয়াবের আশা। সওয়াবের আশা ও নিয়ত না থাকলে তা পরকালে পাওয়া যাবে না। মহানবী সা: বলেন, “আল্লাহ তাআলা যখন তার মুমিন বান্দার জগদ্বাসীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রিয়জন (সন্তান)কে তুলে নেন; কিন্তু এর ফলে সে তাতে ধৈর্য্য ধরে ও সওয়াবের আশা রাখে, তখন তিনি তাকে জান্নাত ব্যতীত অন্য কোন সওয়াব প্রদান করতে পছন্দ করেন না।” (নাসাঈ, আহকামূল জানায়েয ২৩ প%)
মহানবী সা:-এর নাতি ইন্তিকাল করলে এক সাহাবী দ্বারা কন্যাকে সালাম দিয়ে এবং এই বলে পাঠালেন যে, “নিশ্চয় আল্লাহ যা নিয়েছেন তা তো তারই ছিল। আর যা দিয়েছিলেন তাও তাঁরই ছিল। (জন্ম-মৃত্যু) সব কিছুই তাঁর নির্ধারিত সময়-সীমা অনুসারে ঘটে থাকে। অতএব সে যেন ধৈর্য ধরে এবং সওয়াবের আশা রাখে।” (বুখারী ১২৮৪ মুসলিম ৯২৩নৎ আহমাদ ৫/২০৪ ২০৬ ২০৭ প্রমুখ)
রোগ-বালাতে ধৈর্য ধারণ করলেও বেহেস্ত পাওয়া যায় আল্লাহর কাছে। মহানবী সা: বলেন, “আল্লাহ তাআলা বলেন, "আমি আমার বান্দাকে যখন তার প্রিয় বস্তুটাকে ছিনিয়ে নিয়ে পরীক্ষা করি, আর সেও এতে ধৈর্য ধারণ করে, তখন এ দুয়ের বিনিময়ে তাকে বেহেস্ত দান করি।” (বুখারী ০৬৫৩নৎ)
একদা এক মহিলা এসে মহানবী সা:-এর দরবারে অভিযোগ করে বলল, "হে আল্লাহর রসুল! আমার মুর্ছা (মৃগী/জিন পাওয়া) রোগ আছে। আপনি আমার জন্য দুআ করুন, যাতে আল্লাহ আমার এ রোগ ভালো করে দেন।?” মহানবী সা: বললেন, “তুমি চাইলে সবর কর, তার জন্য তুমি বেহেস্ত পাবে। আর যদি তা না চাও, তাহলে আমি তোমার জন্য দুআ করি, যাতে আল্লাহ তোমাকে আরোগ্য দান করেন।” মহিলাটি বললো, "বরং আমি সবর করব। কিন্তু সে সময় আমি বেপর্দা

হয়ে যাই। তার জন্য আপনি দুআ করুন, যাতে আমি তা না হই।" তিনি তার জন্য দুআ করলেন।" (বুখারী৫৬৫২, মুসলিম ২৫৭৬নং) সুরাহ আলে ইমরান এর ২০০ নং আয়াতে আল্লাহ বলেছেন, "হে ঈমানদারগন! তোমরা ধৈর্য ধারণ করো এবং (ধৈর্য ধরার জন্য) পরস্পর প্রতিযোগিতা করো।"

ধৈর্য্য ধারণের ক্ষেত্রসমূহ:

ধৈর্য্য ধারণ করা মু'মিনের উত্তম বৈশিষ্ট্য।

#আল্লাহর ইবাদতে অটল থাকার জন্য ধৈর্য ধারণ করতে হবে।

বিপদাপদে সবর রাখতে হবে।

দাওয়াতী কাজে বিরোধিতা আসলে ধৈর্য ধারণ করতে হবে।

শত্রুর নির্যাতনে সবর রাখতে হবে।

মানুষের কষ্টদায়ক কথা ও কাজের ওপর সবর রাখতে হবে।

কুরআনের আলোকে নবী ও রাসুলগনের সবরের উদাহরণ :

নবী ও রাসুলগন সবচেয়ে বেশী ও কঠিন সবরের পরীক্ষা দিয়েছেন। তারা আমাদের জন অবশ্যই অনুকরণীয়।

সওর গুহায় শত্রুদের ভয়ে ভীত হয়ে ব্যাকুল স্বরে আবু বাকর রা: যখন আল্লাহর রসূল সা: কে শঙ্কা প্রকাশ করলেন ও বললেন, "ওদের কেউ যদি তার নিজের পায়ের দিকে তাকায়, তাহলে সে আমাদেরকে দেখে নেবে।" কিন্তু আল্লাহর ভরসা ও আস্থা নিয়ে মহানবী সা: বললেন, "আমরা তো কেবল দু'জন নই। তুমি দুশ্চিন্তা করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন।" (সুরাহ তাওবাহ: ৪০ নং আয়াত) অতএব ভয় কিসের আমাদের? আমাদের বিপদ বা কষ্ট কি নবীদের থেকে বেশী? না তা তো হতেই পারে না। মহান আল্লাহ তার মহানবীকে সম্বোধন করে বলেন, "অর্থাৎ, অতএব তুমি ধৈর্য ধারণ কর যেমন ধৈর্ধ ধারণ করেছিল

দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ রসুলগণ। আর ওদের বিষয়ে ত্বরা করো না।” (সূরা আহকাফ : ৩৫ নং আয়াত)

কষ্ট বরণ করে গেছেন নূহ আ:, সহ্য করেছেন আগুনে পরে ইব্রাহীম আ:, ধৈর্যের পরীক্ষা দিয়েছেন ইসমাঈল আ: যবেহ হতে গিয়ে, কত শত কষ্ট স্বীকার করেছেন যাকারিয়া, মুসা, ঈসা এবং আরো সকল আম্বিয়াগণ। কত কষ্ট সহ্য করে শত ধৈর্য ধারণ করে গেছেন আয়্যুব আ:; মহান আল্লাহ তার কথা বলেন, “অর্থাৎ, আমি তাকে পেলাম ধৈর্যশীলরূপে। কত নেক বান্দা সে! সে ছিল আমার অভিমুখী। “

ইউসুফকে তার ভাইরা যখন কুঁয়োতে ফেলে দিয়ে তার জামায় মিথ্যা খুন লাগিয়ে নিয়ে এসে পিতা ইয়াকুবকে খবর জানাল, তখন তিনি বললেন, (কক্ষনো এমন নয়) অর্থাৎ, বরং তোমরা এক মনগড়া কথা নিয়ে এসেছ। সুতরাং পূর্ণ ধৈর্য ধারণই আমার পক্ষে শ্রেয়। তোমরা যা বলছ সে বিষয়ে একমাত্র আল্লহই আমার সাহায্যস্থল। (সুরাহ ইউসুফ : ১৮ নং আয়াত)

পুনরায় রাজা হওয়ার পর আপন ভাই বিনিয়ামিনকে ইউসুফ বিশেষ কৌশলে আটকে রাখলেন, তখন তার ভাইরা পিতাকে এসে বলল যে, বিনিয়ামিন চুরির দায়ে ধরা পড়েছে, তখনও তিনি বললেন, “বরং তোমরা এক মনগড়া কথা নিয়ে এসেছ। সুতরাং পূর্ণ ধৈর্য ধারণই আমার পক্ষে শ্রেয়। হয়তো আল্লাহ ওদের উভয়কে এক সঙ্গে আমার নিকট এনে দেবেন। নিশ্চয় তিনি সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। (সুরাহ ইউসুফ: ৮৩ নং আয়াত)

তেমনি ধৈর্য ধরলেন ইউসুফ কুয়োতে, ধৈর্য ধরলেন মাতা-পিতা ও আপন ভাই-এর বিচ্ছেদে, ধৈর্য ধরলেন আযীযের রাজ-প্রাসাদে রাণী যুলাইখার প্রেম নিবেদনের মুহূর্তে এবং ধৈর্য ধরলেন কারাগারে। ফলে সকলেই সেই ধৈর্যের সুফল পেলেন। লাভ করলেন পরম সুখ ও চরম তৃপ্তি এ দুনিয়াতে এবং আখেরাতে।

ধৈর্যচ্যুত হননি ইউনুস নবী। মাছের পেটে ধৈর্যের পরীক্ষা দিয়েছেন, তবুও সৃষ্টিকর্তার প্রতি অভিযোগ আনেন নি। বরং ক্ষুব্ধ হয়ে নিজের ত্রুটি স্বীকার করে বলেছিলেন, "অর্থাৎ, তুমি ছাড়া কোন সত্য উপাস্য নেই, তুমি পবিত্র, অবশ্যই আমি সীমালংঘনকারী।"

তার মত ক্ষুব্ধ না হয়ে ধৈর্য ধরতে বলা হয়েছে আমাদের নবী সা:-কে। মহান আল্লাহ বলেন, "অর্থাৎ, অতএব তুমি তোমার প্রতিপালকের নির্দেশের অপেক্ষায় ধৈর্য ধারণ কর এবং মাছওয়ালা (ইউনুসের) মত অধৈর্য হয়ো না। সে বিষাদ-আচ্ছন অবস্থায় কাতর প্রার্থনা করেছিল। (সুরাহ কলাম: ৪৮ নংআয়াত)

আমাদের নবী হযরহ মুহম্মদ সা: ধৈর্য ধরলেন তায়েফে, বদর, উহুদ ও আরো যুদ্ধ ক্ষেত্রে। উকবাহ বিন আবী মুআইত্ব তার পিঠে/ঘাড়ে উটনীর ফুল চাপিয়ে দিলে, উম্মে জামীল তার পথে কাটা বিছিয়ে রাখলে, কুরাইশদের আরো কত শত নিপীড়নের সামনে তিনি ধৈর্য ধারণ করেছেন। দাওয়াতের কাজে কত লোকের কথার বাধুনির বিধুনিতে তিনি ধৈর্য ধরেছেন। তাকে লোকেরা যাদুকর, কবি ও পাগল বলে ব্যথা দিয়েছে। তাকে ধৈর্য ধরতে আদেশ করেছেন তার প্রতিপালক, "অর্থাৎ, লোকে যা বলে তাতে তুমি ধৈর্য ধারণ কর এবং সৌজন্য সহকারে তাদেরকে পরিহার করে চলুন ভদ্রভাবে। "(সুরা মুয্যাম্মিল :১০ নং আয়াত)

তিনি আরো নির্দেশ দিয়ে বলেন, "যদি তোমরা শাস্তি দাও তবে ঠিক ততখানি শাস্তি দেবে যতখানি অন্যায় তোমাদের প্রতি করা হয়, তবে তোমরা ধৈর্য ধারণ করলে ধৈর্যশীলদের জন্য তাই তো উত্তম। তুমি ধৈর্য ধারণ কর, তোমার ধৈর্য হবে আল্লাহর সাহায্যে। ওদের ষড়যন্ত্রে তুমি মনঃক্ষুন্ন হয়ো না। আল্লাহ অবশ্যই তাদের সঙ্গে থাকেন যারা মুত্তাকী ও সকর্মপরায়ণ। (সুরা নাহল : ১২৬-১২৮ নং আয়াত)।

ধৈর্যের গুরুত্ব বর্ণনা করে সুরা আসরে মহান আল্লাহ বলেন, "মহাকালের শপথ! মানুষ অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত। তবে তারা নয়, যারা ঈমান এনে সৎকর্ম করেছে এবং

একে অপরকে সত্য ও ধৈর্যের উপদেশ দিয়েছে।” দ্বীনের কাজে ধৈর্যশীলতা প্রয়োগ করলে তার ফল ফলে সুন্দর। যেহেতু ধৈর্য বড় তিক্ত, কিন্তু তার পরিণাম ভারী মধুর। বৃক্ষের ছাল তিক্ত হলেও তার ফল বড় মিষ্টি। ধৈর্য ধরা খুব কঠিন হলেও তার পরিণাম বড় শুভ। সুবহানাল্লাহী ওয়া বি হামদীহি।

পরকালের আশা:

দুদিনের এ পার্থিব জীবনে আল্লাহ তাআলার সর্বাধিক আনুগত্য ও ইবাদত করে গেছেন যিনি, তিনি যে আমাদের নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- এ নিয়ে কি আর কোনো দ্বিমত আছে! তাঁর আমল-ইবাদত যে সকল মানুষের চেয়ে শ্রেষ্ঠ- তা কি আর বলার অপেক্ষা রাখে! তিনিও যদি বলেন, আমার আমল আমাকে নাজাত দিতে পারবে না; তাহলে আমরা নিজেদের ব্যাপারে কেমন এক নিরাশায় যেন আচ্ছন্ন হয়ে পড়ি! সৃষ্টিকুলের সেরা মানবকাফেলা আম্বিয়ায়ে কেরাম আলাইহিমুস সালামেরও যিনি সর্দার, তিনিই যদি নিজ আমল দিয়ে জান্নাতে যেতে না পারেন, তাহলে আমাদের কী দশা হবে! ভাবতেই কেমন শরীর কেঁপে ওঠে! অথচ এটাই বাস্তবতা। প্রিয় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কণ্ঠেই শুনুন-

لَنْ يُدْخِلَ أَحَدًا عَمَلُهُ الْجَنَّةَ

নিজ আমল কাউকেই জান্নাতে নিয়ে যেতে পারবে না!
সাহাবায়ে কেরামের সচকিত প্রশ্ন : ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনাকেও নয়?!
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন :

لاَ، وَلاَ أَنَا إِلاَّ أَنْ يَتَغَمَّدَنِي اللَّهُ بِفَضْلٍ وَرَحْمَةٍ.

না, আমাকেও নয়, যদি না আল্লাহ দয়া ও অনুগ্রহ দিয়ে আমাকে জড়িয়ে নেন। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ কথাটুকু থেকেই আমরা আশায় বুক বাঁধতে পারি। যে রাহমানুর রাহীমের দয়ায় তিনি জান্নাতে প্রবেশ করবেন,

দয়াময় সেই সত্তার নিকট তো রহমতের আশা আমরাও করতে পারি। হাদীসের শেষাংশটুকু লক্ষ করুন-

فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا، وَلاَ يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ إِمَّا مُحْسِنًا فَلَعَلَّهُ أَنْ يَزْدَادَ خَيْرًا وَإِمَّا مُسِيئًا فَلَعَلَّهُ أَنْ يَسْتَعْتِبَ.

তাই তোমরা ইবাদতে সঠিক পন্থা অবলম্বন করো এবং ইবাদত নিয়ে বাড়াবাড়ি করা থেকে বেঁচে থেকো। আর তোমাদের কেউ যেন মৃত্যুর কামনা না করে। সে যদি সৎকর্মপরায়ণ হয় তাহলে সে হয়তো কল্যাণের পথে আরও এগিয়ে যাবে, আর যদি পাপীও হয় তাহলে হতে পারে, সে পাপ থেকে তওবা করে আল্লাহর প্রিয়পাত্র হবে। -সহীহ বুখারী, হাদীস ৫৬৭৩

আমাদের আশাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যে এই একটি মাত্র হাদীসই যথেষ্ট, যেখানে বলা হচ্ছে-

১. নিজের যোগ্যতা ও আমল নয়, বরং আল্লাহ পাকের দয়া ও অনুগ্রহই হল সকল সফলতা ও মুক্তির মূল;

২. ইবাদত করতে গিয়েও নিজের সাধ্য ও সক্ষমতার প্রতি খেয়াল রাখতে হবে, এড়িয়ে চলতে হবে সাধ্যাতিরিক্ত সকল পদক্ষেপ;

৩. মৃত্যু কামনা করতে পারবে না কেউ। ভালো হলেও নয়, খারাপ হলেও নয়। আর ভালো-মন্দ মিলিয়েই তো মানুষ। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের আশা দিয়েছেন- হায়াত দীর্ঘ হলে ভালো কাজ আরও বাড়তে পারে, আর মন্দ কাজ থেকে ফিরে আসার সৌভাগ্যও মিলে যেতে পারে।

আশার উপাদান যে কত ধরনের- তা গুনে গুনে হিসাব করা সহজ নয়। কয়েকটি উদাহরণ লক্ষ্য করুন-

আল্লাহ পাক রাহমানুর রাহীম। তিনি ক্ষমাশীল দয়ালু। কিন্তু তিনি কাকে ক্ষমা করবেন? কতটুকু অপরাধ ক্ষমা করবেন? কতবার ক্ষমা করবেন? কতক্ষণ ক্ষমা

করবেন? এসবের উত্তরে এক কথায় বলা যায়- অপরাধ যত বড়ই হোক, অপরাধী যদি তওবা করে এবং আন্তরিকভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করে তাহলে তিনি ক্ষমা করে দেবেন। এক্ষেত্রে কোনো সীমা-পরিসীমা নেই। কোনো নির্দিষ্ট মাত্রা নেই। শর্ত একটাই- আন্তরিকভাবে ক্ষমাপ্রার্থনা। তাহলেই তিনি ক্ষমা করবেন। অপরাধের ধরন যত জঘন্যই হোক, পরিমাণ যত বেশিই হোক- এগুলো কোনো বিবেচ্য বিষয় নয়। হাদীস শরীফে বর্ণিত একটি ঘটনা বলি- বনি ইসরাইলের এক ব্যক্তি নিরানব্বইজন মানুষকে হত্যা করেছিল। এরপর সে তখনকার সেরা আলেমের সন্ধান করল। লোকেরা তাকে এক পাদ্রী দেখিয়ে দিল। পাদ্রীর কাছে গিয়ে সে জানাল- সে নিরানব্বইজন মানুষ হত্যা করে এসেছে। তার জন্য কি এখন তওবার কোনো সুযোগ আছে? পাদ্রী বলল : না, এমন পাপের তওবার কোনো সুযোগ নেই। লোকটি তখন পাদ্রীকেও হত্যা করল এবং খুনের সংখ্যা একশ পূর্ণ করল। এরপর সে আরেকজন সেরা আলেমের সন্ধান করল। লোকেরা তাকে আরেকজন আলেম দেখিয়ে দিল। তার কাছে গিয়ে সে জানাল- সে একশজন মানুষ হত্যা করে এসেছে। এখন কি তার জন্যে তওবা করার সুযোগ আছে? আলেম বললেন : কেন নয়, কে তার তওবাকে বাধা দিয়ে রাখতে পারে! এরপর তিনি তাকে বললেন : ‘তুমি এ এলাকা ছেড়ে অমুক অঞ্চলে চলে যাও। সেখানে কিছু মানুষ আছে, যারা আল্লাহর ইবাদত করে। তাদের সঙ্গে তুমিও ইবাদত শুরু করে দাও। তোমার এ এলাকায় তুমি আর ফিরে এসো না। জায়গাটি ভালো নয়।’ কথামতো সে চলতে শুরু করল। এ আলেমের নির্দেশিত অঞ্চলটি এখন তার গন্তব্য। কিন্তু অর্ধেক পথ যখন সে অতিক্রম করল, তখনই তার মৃত্যু হল। মৃত্যুর পর শুরু হল আরেক দৃশ্য। তাকে নেয়ার জন্যে রহমতের ফেরেশতাদলও উপস্থিত, আজাবের ফেরেশতারাও উপস্থিত। তাকে নিয়ে দুই দল ফেরেশতার টানাটানি। রহমতের ফেরেশতাদলের বক্তব্য- সে তো তওবা করে আল্লাহর অভিমুখী হয়েই এখানে এসেছে। আর

আজাবের ফেরেশতারা যুক্তি দিল- সে তো কখনোই কোনো ভালো কাজ করেনি। দুই দল ফেরেশতার বিবাদ মেটাতে আল্লাহ মানুষরূপে আরেক ফেরেশতা পাঠালেন। সবাই তাকে ফয়সালা করার ভার দিল। এ ফেরেশতা বললেন : তোমরা মেপে দেখ, সে যে অঞ্চলের কাছাকাছি হবে সেখানকার বলেই গণ্য হবে। এদিকে আল্লাহর পক্ষ থেকে অঞ্চল দুটিকে আদেশ করা হল- তার নিজ অঞ্চলটি যেন দূরে সরে যায় আর কাঙ্ক্ষিত অঞ্চলটি যেন কাছে চলে আসে। মাপার পর দেখা গেল, সে তার গন্তব্যের দিকে আধা হাত এগিয়ে আছে। তখন রহমতের ফেরেশতারা তাকে নিয়ে গেল। (-সহীহ বুখারী, হাদীস ৩৪৭০; সহীহ মুসলিম, হাদীস ২৭৬৬)

কুরআনে কারীমে কত রকম পাপের শাস্তির কথা বলা হয়েছে! কোথাও শাস্তির পরিমাণ নির্ধারিত! আবার কোথাও শুধু বলা হয়েছে 'মহাশাস্তি'র কথা, কিংবা 'যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি'র কথা। শাস্তির কথা বলে বলেও আবার রহমতের কথা বলেছেন। আশার বাণী শুনিয়েছেন। অপরাধ যত জঘন্যই হোক, খাঁটি মনে তওবা করলে তা কবুল করার প্রতিশ্রম্নতি দিয়েছেন। এই যে দেখুন, খ্রিস্টানরা কখনো হযরত ঈসা আলাইহিস সালামকে আল্লাহর ছেলে বলে থাকে, কখনো বা 'খোদা'ই বলে বসে। তাদের এই ধৃষ্টতা কুরআনেই বর্ণিত হয়েছে। সেই বর্ণনার পর আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে স্বীয় রহমতের দিকে আহক্ষান করেছেন এভাবে-

اَفَلَا يَتُوْبُوْنَ اِلَى اللهِ وَ يَسْتَغْفِرُوْنَهٗ وَ اللهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ.

তারা কি আল্লাহর কাছে তওবা করবে না এবং তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করবে না? আল্লাহ ক্ষমাশীল দয়ালু। -সূরা মায়িদা (৫) : ৭৪

ফেরাউন তো নিজেকে খোদা বলেই দাবি করে বসেছিল! তার ঘটনাও পবিত্র কুরআনের অনেক স্থানে বর্ণিত হয়েছে। অথচ এই ভ- স্বঘোষিত খোদাকেও

পরম করুণাময় আল্লাহ রহমতের দিকে ডেকেছেন। বিশেষ হেদায়েত ও নির্দেশনা দিয়ে তিনি তাঁর নবী হযরত মূসা আলাইহিস সালামকে এ 'নকল' খোদার কাছে পাঠিয়েছেন। পবিত্র কুরআনের একটি সংক্ষিপ্ত উদ্ধৃতি-

اِذْهَبْ اِلٰى فِرْعَوْنَ اِنَّهٗ طَغٰى، فَقُلْ هَلْ لَّكَ اِلٰٓى اَنْ تَزَكّٰى، وَ اَهْدِيَكَ اِلٰى رَبِّكَ فَتَخْشٰى، فَاَرٰىهُ الْاٰيَةَ الْكُبْرٰى، فَكَذَّبَ وَعَصٰى، ثُمَّ اَدْبَرَ يَسْعٰى، فَحَشَرَ فَنَادٰى، فَقَالَ اَنَا رَبُّكُمُ الْاَعْلٰى.

ফেরাউনের নিকট যাও, সে তো সীমালঙ্ঘন করেছে। এবং বলো, তোমার কি আগ্রহ আছে যে তুমি পবিত্র হও আর আমি তোমাকে তোমার প্রতিপালকের দিকে পথপ্রদর্শন করি, যেন তুমি তাকে ভয় কর? অতপর সে তাকে মহানিদর্শন দেখাল। কিন্তু সে অস্বীকার করল এবং অবাধ্য হল। এরপর সে পেছনে ফিরে প্রতিবিধানে সচেষ্ট হল। সকলকে সমবেত করে উচ্চস্বরে সে ঘোষণা করে বলল : আমিই তোমাদের সর্বোচ্চ প্রতিপালক! -সূরা নাযিয়াত (৭৯) : ১৭-২৪

মিথ্যা প্রভুত্বের দাবিদার যে ব্যক্তি, তার জন্যও উন্মোচিত আসল প্রভুর রহমতের দুয়ার! এমন প্রভুর কাছে তো আশা করাই যায়। কত সুস্পষ্ট তাঁর ঘোষণা-

قُلْ يٰعِبَادِىَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللهِ اِنَّ اللهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ.

হে আমার বান্দাগণ, যারা নিজেদের প্রতি অবিচার করেছ! আল্লাহর অনুগ্রহ থেকে নিরাশ হয়ো না। সন্দেহ নেই, আল্লাহ সকল পাপ ক্ষমা করে দেবেন। নিশ্চয়ই তিনিই ক্ষমাশীল, দয়ালু। -সূরা যুমার (৩৯) : ৫৩

আল্লাহ তাআলার রহমত যে কত ব্যাপক- তা কল্পনা করার জন্যে একটি হাদীসের উদ্ধৃতি দিই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

جَعَلَ اللَّهُ الرَّحْمَةَ مِئَةَ جُزْءٍ فَأَمْسَكَ عِنْدَهُ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ جُزْءًا وَأَنْزَلَ فِي الأَرْضِ جُزْءًا وَاحِدًا فَمِنْ ذَلِكَ الْجُزْءِ يَتَرَاحَمُ الْخَلْقُ حَتَّى تَرْفَعَ الْفَرَسُ حَافِرَهَا عَنْ وَلَدِهَا خَشْيَةَ أَنْ تُصِيبَهُ.

আল্লাহ রহমতকে একশ ভাগ করেছেন। নিজের কাছেই রেখে দিয়েছেন নিরানবব্বই ভাগ। একভাগ পাঠিয়েছেন পৃথিবীতে। সেই এক ভাগের কারণেই পুরো সৃষ্টিজগত পরস্পরকে দয়া করে। এমনকি ঘোড়াও তার পা উঁচু করে রাখে যেন তার বাচ্চা কোনো কিছুতে আক্রান্ত না হয়। (-সহীহ বুখারী, হাদীস ৬০০০)

দুনিয়ার জীবন ক্ষণস্থায়ী, কিন্তু পরকালের অনন্ত সুখই চূড়ান্ত সুখের স্থান, যা আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন। এই বিশ্বাস হতাশাকে দূর করে এবং শান্তিতে জীবনযাপন করতে সাহায্য করে।

তাওয়াক্কুল বা আল্লাহর ওপর ভরসা:

তাওয়াক্কুল তথা আল্লাহর ওপর ভরসা করাকে ঈমানের অনিবার্য দাবি এবং আখিরাতের সফলতার একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। যখন কোনো কাজে ব্যর্থতা আসে, তখন হতাশ না হয়ে আল্লাহর ওপর ভরসা করা উচিত। "যে ব্যক্তি আল্লাহর ওপর ভরসা করে তার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট (সূরা তালাক্ব, আয়াত ৩)।

তাওয়াক্কুল এর কয়েকটি অর্থ। তা হলো

(এক) আল্লাহর পথ নির্দেশনার উপর বান্দার পূর্ণ আস্থা থাকবে এবং সে মনে করবে যে আল্লাহ প্রকৃত সত্য সম্পর্কে যে জানকারী, নীতিমালা, হালাল- হারামের যে সীমারেখা দুনিয়াতে জীবন- যাপনের জন্য যেসব বিধিনিষেধ দিয়েছেন তাই সত্য ও সঠিক, তা পালনেই রয়েছে কল্যাণ।

(দুই) দুনিয়া ও আখেরাতের প্রতিটি ব্যাপারে মানুষের সাফল্য প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর তৌফিক ও সাহায্যের উপর নির্ভর করে।

(তিন) আল্লাহ ঈমান ও নেক কাজের পথ অবলম্বনকারী এবং বাতিলের বিরুদ্ধকারী ব্যক্তিকে যে প্রতিদানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তার প্রতি পরিপূর্ণ আস্থা রাখতে হবে।

সকল নবী ও রাসুলগন একমাত্র রব আল্লাহর প্রতি পরিপূর্ণ ভরসা করেছেন।এবং সেমতে জীবন- যাপন করেছেন।আল্লাহ রব্বুল আ'লামিন সুরা আলে ইমরানের ১৫৯ নং আয়াতে বলেছেন-

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللهِ لِنْتَ لَهُمْ ۚ وَ لَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوْا مِنْ حَوْلِكَ ۪ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَ اسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَ شَاوِرْهُمْ فِى الْاَمْرِ ۚ فَاِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ ؕ اِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِيْنَ﴿١٥٩﴾

অর্থ : অতঃপর আল্লাহর পক্ষ থেকে রহমতের কারণে তুমি তাদের জন্য নম্র হয়েছিলে। আর যদি তুমি কঠোর স্বভাবের, কঠিন হৃদয়সম্পন্ন হতে, তবে তারা তোমার আশপাশ থেকে সরে পড়ত। সুতরাং তাদেরকে ক্ষমা কর এবং তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর। আর কাজে-কর্মে তাদের সাথে পরার্মশ কর। অতঃপর যখন সংকল্প করবে তখন আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করবে। নিশ্চয় আল্লাহ তাওয়াক্কুলকারীদেরকে ভালবাসেন।

মহান নৈতিকতার অধিকারী নবী মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর উপর আল্লাহর কৃত অনুগ্রহসমূহের একটি অনুগ্রহের কথা উল্লেখ করে বলা হচ্ছে যে, তোমার মধ্যে যে কোমলতা ও নম্রতা তা আল্লাহর রহমতেরই ফল। আর দ্বীনের প্রচার-প্রসারের জন্য তো এই কোমলতার প্রয়োজন অনেক। তুমি যদি কোমল ও নরম না হয়ে কঠিন হৃদয়ের মালিক হতে, তাহলে মানুষ তোমার কাছে না এসে আরো দূরে সরে যেত। কাজেই তুমি মানুষের সাথে ব্যবহারে ক্ষমা ব্যবহার করতে থাক।

মুসলিমদের মনস্তষ্টির জন্য পরামর্শ করে নিবেন। এই আয়াত দ্বারা পরামর্শ করার গুরুত্ব, তার উপকারিতা এবং তার প্রয়োজনীয়তা ও বৈধতা প্রমাণিত হয়। পরামর্শ করার এই নির্দেশ কারো নিকট ওয়াজিব এবং কারো নিকট মুস্তাহাব। (ইবনে কাসীর) ইমাম শওকানী লিখেছেন যে, 'শাসকদের জন্য অত্যাবশ্যক হল, তাঁরা এমন সব ব্যাপারে উলামাদের সাথে পরামর্শ করবেন, যে সব ব্যাপারে তাঁদের জ্ঞান নেই অথবা যে ব্যাপারে তাঁরা সমস্যায় পড়েন। সেনাবাহিনীর ঊর্ধ্বতন অফিসারদের সাথে সৈন্য সংক্রান্ত বিষয়ে, জনগণের দায়িত্বে নিয়োজিত নেতাদের সাথে জনসাধারণের কল্যাণ প্রসঙ্গে এবং অন্যান্য বিভিন্ন অঞ্চলে নিযুক্ত সরকারী দায়িত্বশীলদের সাথে সেই অঞ্চলের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে পরামর্শ করবেন।' ইবনে আত্বিয়্যাহ বলেন, 'এমন শাসকদের বরখাস্ত করার ব্যাপারে কোনই দ্বিমত নেই, যাঁরা আলেম ও দ্বীনদারদের সাথে কোন পরামর্শ করেন না।' আর এই পরামর্শ সেই সব বিষয়ের মধ্যেই সীমিত থাকবে, যে সব ব্যাপারে শরীয়ত নীরব

(যে সম্বন্ধে শরীয়তের সুস্পষ্ট কোন সমাধান নেই) অথবা যার সম্পর্ক হল প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনার সাথে। (ফাতহুল ক্বাদীর)

পরামর্শ করার পর যে মতের উপর তোমার সংকল্প সৃষ্টি হবে, আল্লাহর উপর ভরসা করে তা কার্যকরী করবে। এ থেকে প্রথমতঃ জানা গেল যে, পরামর্শ করার পর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের কাজ হবে শাসকের, পরামর্শদাতাদের অথবা তাদের সংখ্যাগরিষ্ঠ লোকেদের হবে না, যেমন সাধারণতন্ত্র রাষ্টে হয়ে থাকে। দ্বিতীয়তঃ সম্পূর্ণ ভরসা ও নির্ভর করতে হবে মহান আল্লাহর উপরে, পরামর্শদাতাদের জ্ঞান-বুদ্ধির উপরে নয়। পরের আয়াতেও আল্লাহর উপর ভরসা করার প্রতি তাকীদ করা হয়েছে।

আমলে সালেহ বা সৎকর্ম:

সৎকর্ম বলতে পুণ্যকাজ, হিতকর বা ভালো কাজ বোঝায়, যা মানুষের নিজের বা অন্যের কল্যাণ বয়ে আনে। আমল' عمل মানে- কর্ম ও আচরণ। صَلَحَ শব্দের অর্থ হলো ভালো, উত্তম, উৎকৃষ্ট, সৎ, সঠিক, যথার্থ, গ্রহণযোগ্য, আল্লাহ নির্দেশিত, সর্বজন স্বীকৃত ন্যায্য ও বাস্তব কর্ম ইত্যাদি।

সাধারণত কুরআনের অনুবাদে আমলে সালেহ অর্থ করা হয়, 'নেক আমল' বা 'ভালো কাজ' বা 'সৎকাজ'। সুতরাং ঈমানের মধ্যেই রয়েছে আমলে সালেহ। সহজভাবে বললে,আমলে সালেহ মূলত ঈমানেরই শাখাপ্রশাখা। শাহ অলী উল্লাহ দেহলভী রহ. এর মতে,প্রতিটি ভালো কাজই ঈমানের অঙ্গ।

মানুষের পরকালীন মুক্তি ও নিষ্কৃতি যে দু'টি জিনিসের ওপর নির্ভরশীল। এর প্রথমটি হচ্ছে ঈমান এবং দ্বিতীয়টি হচ্ছে আমলে সালেহ বা নেক আমল। এককথায় যদি বলতে হয়, ঈমান হচ্ছে আল্লাহ পাকের দেয়া বুনিয়াদি বিধি-বিধানের ওপর পরিপূর্ণভাবে বিশ্বাস স্থাপন করার নাম। আর আমলে সালেহ হচ্ছে সে বিধানাবলি অনুসারে আমল করা ও এগুলোর বাস্তবায়ন করা। যেভাবে একটি ইমারত ভিত্তি ছাড়া প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না, তেমনি দেয়াল ও স্তম্ভ ছাড়াও সে ইমরাত দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না। ঈমান হচ্ছে সে ভিত্তি বা বুনিয়াদ আর আমলে সালেহ বা নেক আমল হচ্ছে সেই দেয়াল।

সৎকর্মের বিভিন্ন রূপ

- **ঈমান ও আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস:** সৎকর্মের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো ঈমান আনা এবং আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা।
- **আল্লাহর পথে ব্যয় করা:** নিজের বা অন্যের প্রয়োজনে আল্লাহর পথে অর্থ ব্যয় করাও সৎকর্মের অন্তর্ভুক্ত।

- **মন্দকে প্রতিহত করা:** কোনো মন্দ কাজ হতে দেখলে তা হাত দ্বারা প্রতিহত করার চেষ্টা করা; যদি তা সম্ভব না হয়, তবে মুখ দ্বারা এবং সেটাও সম্ভব না হলে মনে মনে ঘৃণা করা।
- **সাধারণ ভালো কাজ:** এমন যেকোনো ভালো কাজ যা নিজের জন্য বা অন্যের জন্য কল্যাণকর, তা সৎকর্মের আওতায় পড়ে।

গুরুত্ব

- **জান্নাত লাভ :** যারা সৎকর্ম করে, তাদের জন্য ক্ষমা ও মহাপ্রতিদান রয়েছে বলে কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে।
- **আল্লাহর ভালোবাসা:** সৎকর্মপরায়ণ লোকদের আল্লাহ ভালোবাসেন এবং তাদের প্রতি অনুগ্রহ করেন।
- **মন্দকে দূর করা:** সৎকর্মের মাধ্যমে মন্দ কাজগুলো দূর হয়ে যায় এবং মানুষের অবস্থা সংশোধন হয়।

সকল প্রকার নেক আমল শান্তি ও সুখ নিয়ে আসে। আল্লাহ রব্বুল আ'লামিন আল- কুরআনে এব্যাপারে বিশদ বিবরণ দিয়েছেন- যেমন

সৎকর্মের প্রতিদানস্বরূপ পাপসমূহ দূরীভূত করা হবে:

وَ الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنۡهُمۡ سَيِّاٰتِهِمۡ وَ لَنَجۡزِيَنَّهُمۡ اَحۡسَنَ الَّذِىۡ كَانُوۡا يَعۡمَلُوۡنَ

আর যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, অবশ্যই আমি তাদের থেকে তাদের পাপসমূহ দূর করে দেব এবং আমি অবশ্যই তাদের সেই উত্তম আমলের প্রতিদান দেব, যা তারা করত। (২৯. আনকাবুত ০৭)

وَ الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَ اٰمَنُوۡا بِمَا نُزِّلَ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّ هُوَ الۡحَقُّ مِنۡ رَّبِّهِمۡ ۙ كَفَّرَ عَنۡهُمۡ سَيِّاٰتِهِمۡ وَ اَصۡلَحَ بَالَهُمۡ

আর যারা ঈমান এনেছে, সৎকর্ম করেছে এবং মুহাম্মাদের প্রতি যা নাযিল করা হয়েছে তাতে বিশ্বাস স্থাপন করেছে ‘আর তা তাদের রবের পক্ষ হতে (প্রেরিত)

সত্য, তিনি তাদের থেকে তাদের মন্দ কাজগুলো দূর করে দেবেন এবং তিনি তাদের অবস্থা সংশোধন করে দেবেন। (৪৭. মুহাম্মদ ০২)

সৎকর্মশীলদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও মহাপ্রতিদান:

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ مِنۡهُمۡ مَّغۡفِرَةً وَّ اَجۡرًا عَظِيۡمًا

তাদের মধ্যে যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, আল্লাহ তাদের জন্য ক্ষমা ও মহাপ্রতিদানের ওয়াদা করেছেন। (৪৮. ফাতহ ২৯)

اِلَّا الَّذِيۡنَ صَبَرُوۡا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ ؕ اُولٰٓئِكَ لَهُمۡ مَّغۡفِرَةٌ وَّ اَجۡرٌ كَبِيۡرٌ

তবে যারা সবর করেছে এবং সৎকর্ম করেছে, তাদের জন্যই রয়েছে ক্ষমা ও মহা প্রতিদান। (১১. হুদ ১১)

وَ مَنۡ يُّؤۡمِنۡۢ بِاللّٰهِ وَ يَعۡمَلۡ صَالِحًا يُّكَفِّرۡ عَنۡهُ سَيِّاٰتِهٖ وَ يُدۡخِلۡهُ جَنّٰتٍ تَجۡرِىۡ مِنۡ تَحۡتِهَا الۡاَنۡهٰرُ خٰلِدِيۡنَ فِيۡهَاۤ اَبَدًا ؕ ذٰلِكَ الۡفَوۡزُ الۡعَظِيۡمُ

আর যে আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে তিনি তার পাপসমূহ মোচন করে দিবেন এবং তাকে প্রবেশ করাবেন জান্নাতসমূহে, যার পাদদেশ দিয়ে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হয়, তথায় তারা স্থায়ী হবে। এটাই মহাসাফল্য। (৬৪. তাগাবুন ০৯)

اِلَّا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمۡ اَجۡرٌ غَيۡرُ مَمۡنُوۡنٍ

কিন্তু যারা ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে তাদের জন্য রয়েছে নিরবচ্ছিন্ন প্রতিদান। (৮৪. ইনশিকাক ২৫)

اِلَّا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَلَهُمۡ اَجۡرٌ غَيۡرُ مَمۡنُوۡنٍ

তবে যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে, তাদের জন্য রয়েছে নিরবচ্ছিন্ন পুরস্কার। (৯৫. তীন ০৬)

সৎকর্মশীলদের জন্য রয়েছে জান্নাত:

وَ مَنۡ يُّؤۡمِنۡۢ بِاللّٰهِ وَ يَعۡمَلۡ صَالِحًا يُّكَفِّرۡ عَنۡهُ سَيِّاٰتِهٖ وَ يُدۡخِلۡهُ جَنّٰتٍ تَجۡرِىۡ مِنۡ تَحۡتِهَا الۡاَنۡهٰرُ خٰلِدِيۡنَ فِيۡهَاۤ اَبَدًا ؕ ذٰلِكَ الۡفَوۡزُ الۡعَظِيۡمُ

আর যে আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে তিনি তার পাপসমূহ মোচন করে দিবেন এবং তাকে প্রবেশ করাবেন জান্নাতসমূহে, যার পাদদেশ দিয়ে

ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হয়, তথায় তারা স্থায়ী হবে। এটাই মহাসাফল্য। (৬৪. তাগাবুন ০৯)

اِنَّ الَّذِیۡنَ اٰمَنُوۡا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمۡ جَنّٰتُ النَّعِیۡمِ

নিশ্চয় যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে তাদের জন্য রয়েছে নিআমতপূর্ণ জান্নাত। (৩১. লুকমান ০৮)

اِنَّ الَّذِیۡنَ اٰمَنُوۡا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمۡ جَنّٰتٌ تَجۡرِیۡ مِنۡ تَحۡتِهَا الۡاَنۡهٰرُ ۬ؕ ذٰلِکَ الۡفَوۡزُ الۡکَبِیۡرُ.

নিশ্চয় যারা ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত। যার তলদেশে প্রবাহিত হবে নহরসমূহ। এটাই বিরাট সফলতা। (৮৫. বুরুজ ১১)

اِنَّ الَّذِیۡنَ اٰمَنُوۡا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ .اُولٰٓئِکَ هُمۡ خَیۡرُ الۡبَرِیَّۃِ .جَزَآؤُهُمۡ عِنۡدَ رَبِّهِمۡ جَنّٰتُ عَدۡنٍ تَجۡرِیۡ مِنۡ تَحۡتِهَا الۡاَنۡهٰرُ خٰلِدِیۡنَ فِیۡهَاۤ اَبَدًا ؕ رَضِیَ اللّٰهُ عَنۡهُمۡ وَ رَضُوۡا عَنۡهُ ؕ ذٰلِکَ لِمَنۡ خَشِیَ رَبَّهٗ

নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে ও সৎকাজ করেছে তারাই সৃষ্টির সর্বোৎকৃষ্ট। তাদের রবের কাছে তাদের পুরস্কার হবে স্থায়ী জান্নাত, যার পাদদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত, সেখানে তারা থাকবে স্থায়ীভাবে। আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট হয়েছেন তারাও আল্লাহর উপর সন্তুষ্ট হয়েছে। এটি তার জন্য, যে স্বীয় রবকে ভয় করে। (৯৮. বাইয়্যেনা ৭-৮)

সৎকর্ম আল্লাহর পছন্দ:

قَالَ رَبِّ اَوۡزِعۡنِیۡۤ اَنۡ اَشۡکُرَ نِعۡمَتَکَ الَّتِیۡۤ اَنۡعَمۡتَ عَلَیَّ وَ عَلٰی وَالِدَیَّ وَ اَنۡ اَعۡمَلَ صَالِحًا تَرۡضٰهُ وَ اَصۡلِحۡ لِیۡ فِیۡ ذُرِّیَّتِیۡ ۚ اِنِّیۡ تُبۡتُ اِلَیۡکَ وَ اِنِّیۡ مِنَ الۡمُسۡلِمِیۡنَ

হে আমার রব, আমাকে সামর্থ্য দাও, তুমি আমার উপর ও আমার মাতা-পিতার উপর যে নিআমত দান করেছ, তোমার সে নিআমতের যেন আমি শোকর আদায় করতে পারি এবং আমি যেন সৎকর্ম করতে পারি, যা তুমি পছন্দ কর। আর আমার জন্য তুমি আমার বংশধরদের মধ্যে সংশোধন করে দাও। নিশ্চয় আমি

তোমার কাছে তাওবা করলাম এবং নিশ্চয় আমি মুসলিমদের অন্তর্ভুক্ত। (৪৬. আহকাফ ১৫)

সৎকর্মের শুভ পরিণাম:

يٰبَنِیۡۤ اٰدَمَ اِمَّا یَاۡتِیَنَّکُمۡ رُسُلٌ مِّنۡکُمۡ یَقُصُّوۡنَ عَلَیۡکُمۡ اٰیٰتِیۡ ۙ فَمَنِ اتَّقٰی وَ اَصۡلَحَ فَلَا خَوۡفٌ عَلَیۡهِمۡ وَ لَا هُمۡ یَحۡزَنُوۡنَ

হে বনী আদম, যদি তোমাদের নিকট তোমাদের মধ্য থেকে রাসূলগণ আসে যারা তোমাদের নিকট আমার আয়াতসমূহ বর্ণনা করবে, তবে যারা তাকওয়া অবলম্বন করবে এবং (আমল) সংশোধন করবে, তাদের উপর কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না। (০৭. আরাফ ৩৫)

সৎকর্মের প্রতিদান:

وَ الَّذِیۡنَ اٰمَنُوۡا وَ اتَّبَعَتۡهُمۡ ذُرِّیَّتُهُمۡ بِاِیۡمَانٍ اَلۡحَقۡنَا بِهِمۡ ذُرِّیَّتَهُمۡ وَ مَاۤ اَلَتۡنٰهُمۡ مِّنۡ عَمَلِهِمۡ مِّنۡ شَیۡءٍ ؕ کُلُّ امۡرِیًٴۢ بِمَا کَسَبَ رَهِیۡنٌ

আর যারা ঈমান আনে এবং তাদের সন্তান-সন্ততি ঈমানের সাথে তাদের অনুসরণ করে, আমরা তাদের সাথে তাদের সন্তানদের মিলন ঘটাব এবং তাদের কর্মের কোন অংশই কমাব না। প্রত্যেক ব্যক্তি তার কামাইয়ের ব্যাপারে দায়ী থাকবে। (৫২. তুর ২১)

আল্লাহ ও রাসুলের আনুগত্য বতীত আমলে সালেহ গ্রহনযোগ্য হবে না:

یٰۤاَیُّهَا الَّذِیۡنَ اٰمَنُوۡۤا اَطِیۡعُوا اللّٰهَ وَ اَطِیۡعُوا الرَّسُوۡلَ وَ لَا تُبۡطِلُوۡۤا اَعۡمَالَکُمۡ

হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর এবং রাসূলের আনুগত্য কর। আর তোমরা তোমাদের আমলসমূহ বিনষ্ট করো না। (৪৭. মুহাম্মদ ৩৩)

সৎকর্মশীল ছাড়া সকলেই ক্ষতিগ্রস্থ:

وَ الۡعَصۡرِ .اِنَّ الۡاِنۡسَانَ لَفِیۡ خُسۡرٍ .اِلَّا الَّذِیۡنَ اٰمَنُوۡا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَ تَوَاصَوۡا بِالۡحَقِّ ۙ وَ تَوَاصَوۡا بِالصَّبۡرِ

সময়ের কসম, নিশ্চয় সকল মানুষ ক্ষতিগ্রস্ততায় নিপতিত। তবে তারা ছাড়া যারা ঈমান এনেছে, সৎকাজ করেছে, পরস্পরকে সত্যের উপদেশ দিয়েছে এবং পরস্পরকে ধৈর্যের উপদেশ দিয়েছে। (১০৩. আসর

প্রকৃত সুখ-শান্তি দুনিয়ার সম্পদ বা ক্ষমতার মধ্যে নয়, বরং তা আল্লাহর প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস, তাঁর স্মরণ এবং সৎকর্মের মধ্যে নিহিত। এছাড়া, পরকালের অনন্ত সুখের প্রত্যাশা এই জীবনে শান্তি ও প্রশান্তি এনে দেয়।

মানব জীবনে সুখী হওয়ার জন্য ১৫টি উপায়:

১) কৃতজ্ঞ হোন এবং শুকরিয়া আদায় করুন:

যে ব্যক্তি মালিকের অকৃতজ্ঞ, সে কখনও সুখী হতে পারে না। আল্লাহ তাআলা সুরাহ ইবরাহীমের ৭ নং আয়াতে বলেন, “আর যখন তোমাদের রব ঘোষণা দিলেন, ‘যদি তোমরা শুকরিয়া আদায় কর, তবে আমি অবশ্যই তোমাদের বাড়িয়ে দেব, আর যদি তোমরা অকৃতজ্ঞ হও, নিশ্চয় আমার আযাব বড় কঠিন’।”

এখানে আল্লাহ রব্বুল আ'লামিন বলেছেন, নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা করলে তোমাদেরকে অধিক পুরস্কারে পুরস্কৃত করব।অর্থাৎ নিয়ামতের অকৃতজ্ঞতা আল্লাহ অত্যন্ত অপছন্দ করেন। যার জন্য তিনি কঠিন শাস্তির ধমক দিয়েছেন। এই জন্য নবী (সাঃ)ও বলেছেন যে, অধিকাংশ মহিলারা স্বামীর অকৃতজ্ঞ হওয়ার কারণে জাহান্নামে যাবে। (মুসলিম, আল-ঈদাইন) তোমরা শুকরিয়া আদায় করো, তাহলে আমি অবশ্যই তোমাদের বাড়িয়ে দেব, আর যদি তোমরা অকৃতজ্ঞ হও, নিশ্চয়ই আমার আজাব বড় কঠিন।’

২) দুনিয়ার রঙিন ও বড় আশা ছাড়ুন:

কেননা দুনিয়ার পেছনে লালায়িত হওয়ার মধ্যে শান্তি রাখা হয়নি।

নবীজি সা: বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি তার সব চিন্তাকে একই চিন্তায় (আখেরাতের চিন্তায়) কেন্দ্রীভূত করেছে, আল্লাহ তার দুনিয়ার চিন্তার জন্য যথেষ্ট। অন্যদিকে যে ব্যক্তি যাবতীয় পার্থিব চিন্তায় নিমগ্ন থাকবে, সে যেকোনো উন্মুক্ত মাঠে ধ্বংস হোক, তাতে আল্লাহর কিছু আসে যায় না। (ইবনে মাজাহ: ২৫৭)

তাছাড়া হায়াতের বিশ্বাস নেই; দীর্ঘ আশা করে লাভ কী? আল্লাহপাক বলেন,

লুকমান : আয়াত -৩৪

اِنَّ اللهَ عِنۡدَهٗ عِلۡمُ السَّاعَةِ ۚ وَ يُنَزِّلُ الۡغَيۡثَ ۚ وَ يَعۡلَمُ مَا فِى الۡاَرۡحَامِ ؕ وَ مَا تَدۡرِىۡ نَفۡسٌ مَّاذَا تَكۡسِبُ غَدًا ؕ وَ مَا تَدۡرِىۡ نَفۡسٌۢ بِاَىِّ اَرۡضٍ تَمُوۡتُ ؕ اِنَّ اللهَ عَلِيۡمٌ خَبِيۡرٌ﴿۳۴﴾

অর্থ :

নিশ্চয় আল্লাহর নিকট কিয়ামতের জ্ঞান রয়েছে। আর তিনি বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং জরায়ূতে যা আছে, তা তিনি জানেন। আর কেউ জানে না আগামীকাল সে কী অর্জন করবে এবং কেউ জানে না কোন্ স্থানে সে মারা যাবে। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সম্যক অবহিত।

হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, গায়েবের চাবিকাঠি হল পাঁচটি, যা আল্লাহ ছাড়া কেউ অবগত নন। (বুখারীঃ সূরা লুকমানের তফসীর, ইস্তিস্কা অধ্যায়)

(ক) কিয়ামত কখন হবে? কিয়ামতের নিকটবর্তী কিছু নিদর্শন নবী (সাঃ) বলেছেন; কিন্তু কিয়ামত প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সঠিক সময় নিশ্চিতরূপে একমাত্র আল্লাহই জানেন, তা কোন ফিরিশতা জানেন না এবং কোন প্রেরিত নবীও না।

(খ) বৃষ্টি কখন কোথায় হবে? মেঘের চিহ্ন ও অনুকূল হাওয়া দেখে আন্দাজ লাগানো হয় বা লাগানো যায় যে, অমুক এলাকায় বৃষ্টি হতে পারে। কিন্তু এ কথা সকলে জানে যে, এই আন্দাজ কখনো সঠিক হয় আবার কখনো বেঠিক। এমনকি আবহাওয়া দফতরের প্রচারিত খবর অনেক সময় সঠিক হয় না। যাতে পরিষ্কার বুঝা যাচ্ছে যে, বৃষ্টি কোথায় কখন হবে একমাত্র আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ জানে না।

(গ) মাতৃগর্ভে কি আছে? বিভিন্ন যন্ত্রের সাহায্যে সম্ভবতঃ অসম্পূর্ণ ধারণা পাওয়া যেতে পারে যে, তা ছেলে না মেয়ে। কিন্তু মাতৃগর্ভের এই বাচ্চা সৎ না অসৎ,

সৌভাগ্যবান না দুর্ভাগ্যবান, পূর্ণ না অপূর্ণ, বিকলাঙ্গ না অবিকলাঙ্গ, সুশ্রী না কুশ্রী হবে ইত্যাদি বিষয়ক জ্ঞান আল্লাহ ছাড়া আর কেউ জানে না।

(ঘ) মানুষ আগামী কাল কি করবে? তা দ্বীনী বিষয় হোক বা পার্থিব বিষয়, কেউ আগামী কালের বিষয়ে জ্ঞান রাখে না যে, আগামী কাল পর্যন্ত তার জীবন থাকবে কি না? আর যদি থাকে, তাহলে সে তাতে কি আমল করবে?

(ঙ) মৃত্যু কোথায় হবে? ঘরে না বাইরে, স্বদেশে না বিদেশে, যুবক অবস্থায় না বৃদ্ধাবস্থায়, নিজের আশা ও চাহিদা পূর্ণ হওয়ার পর নাকি তার পূর্বে? এ সব কেউ জানে না।

৩) অন্তরে শান্তি পাচ্ছেন না? তাহলে জিকির করুন:

ইরশাদ হয়েছে,

আর-রাদ : আয়াত- ২৮

اَلَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا وَ تَطۡمَئِنُّ قُلُوۡبُهُمۡ بِذِكۡرِ اللّٰهِ ؕ اَلَا بِذِكۡرِ اللّٰهِ تَطۡمَئِنُّ الۡقُلُوۡبُ

অর্থ :

‘যারা ঈমান আনে এবং আল্লাহর স্মরণে যাদের অন্তর প্রশান্ত হয়; জেনে রাখ, আল্লাহর স্মরণ দ্বারাই অন্তরসমূহ প্রশান্ত হয়’।

অর্থাৎ আল্লাহর স্মরণ বা যিকরের অর্থ তাঁর তওহীদের (একত্ববাদের) বর্ণনা, যার দ্বারা মুশরিকদের অন্তর সঙ্কুচিত হয়ে যায়। অথবা যিকর অর্থঃ তাঁর ইবাদত, কুরআন তিলাঅত, নফল ইবাদত এবং দু'আ ও মুনাজাত; যা ঈমানদারদের মনের খোরাক। অথবা তাঁর আদেশ-নির্দেশ পালন করা; যা ব্যতিরেকে ঈমানদার ও পরহেযগারগণ অস্থির থাকেন।

৪) জীবনে কষ্ট-ক্লেশের জন্য প্রস্তুত থাকুন:

কেননা ‘পরীক্ষা যত কঠিন, পুরস্কার তত বড়। আল্লাহ তাআলা তাদেরকে পরীক্ষায় ফেলেন, যাদের তিনি ভালোবাসেন। যেমন হজরত ইবরাহিম (আ.)-এর কাছ থেকে আল্লাহ তাআলা একের পর এক কঠিন পরীক্ষা নিয়েছেন। আল্লাহর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য তিনি তাঁর প্রাণপ্রিয় সন্তানকে আল্লাহর জন্য উৎসর্গ করতেও দ্বিধাবোধ করেননি। ইরশাদ হয়েছে, ‘যখন তারা উভয়ে আনুগত্য প্রকাশ করল এবং ইবরাহিম তার পুত্রকে কাত করে শোয়াল, তখন আমি তাকে ডেকে বললাম, হে ইবরাহিম, তুমি তো স্বপ্নাদেশ সত্যই পালন করলে—এভাবেই আমি সৎকর্মপরায়ণদের পুরস্কৃত করে থাকি।’ (সুরা সাফফাত: ১০৩-১০৫)

৫) কারো ধন্যবাদ আশা করবেন না; নিঃস্বার্থভাবে কাজ করে যান:

এতেই শান্তি মিলবে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

আল-ইনসান : আয়াত ৯

اِنَّمَا نُطۡعِمُکُمۡ لِوَجۡہِ اللّٰہِ لَا نُرِیۡدُ مِنۡکُمۡ جَزَآءً وَّ لَا شُکُوۡرًا

অর্থ :
তারা বলে,‘আমরা তো আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে তোমাদেরকে খাদ্য দান করি। আমরা তোমাদের থেকে কোন প্রতিদান চাই না এবং কোন শোকরও না।

অর্থাৎ (তারা বলে,) ‘শুধু আল্লাহর মুখমন্ডল (দর্শন বা সন্তুষ্টি) লাভের উদ্দেশ্যে আমরা তোমাদেরকে অন্নদান করি, আমরা তোমাদের নিকট হতে প্রতিদান চাই না, কৃতজ্ঞতাও নয়।

৬) মানুষ যা আশংকা করে, তার অধিকাংশই ঘটে না—এ কথাটি মনে রাখবেন:

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হয়েছে, আল-ইমরান : আয়াত ১৭৫

اِنَّمَا ذٰلِكُمُ الشَّيۡطٰنُ يُخَوِّفُ اَوۡلِيَآءَهٗ ۪ فَلَا تَخَافُوۡهُمۡ وَ خَافُوۡنِ اِنۡ كُنۡتُمۡ مُّؤۡمِنِيۡنَ١٧٥

অর্থ :

সে তো শয়তান। সে তোমাদেরকে তার বন্ধুদের ভয় দেখায়। তোমরা তাদেরকে ভয় করো না, বরং আমাকে ভয় কর, যদি তোমরা মুমিন হও।

অর্থাৎ, তোমাদের মনের মধ্যে এই কল্পনা ও ধারণা সৃষ্টি করে যে, তারা বড়ই সুদৃঢ় ও অতীব শক্তিশালী।

যখন সে তোমাদের মধ্যে এই ধরনের ধারণায় পতিত করবে, তখন তোমরা কেবল আমারই উপর ভরসা রাখবে এবং আমার দিকেই প্রত্যাবর্তন করবে। আমিই তোমাদের জন্য যথেষ্ট হব এবং তোমাদের সাহায্য করব। যেমন অন্যত্র তিনি বলেছেন, [أَلَيْسَ اللهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ] "আল্লাহ কি তাঁর বান্দার জন্য যথেষ্ট নন?" (সূরা যুমার ৩৯:৩৬ আয়াত) তিনি আরো বলেন, [كَتَبَ اللهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي] অর্থাৎ, আল্লাহ সিদ্ধান্ত করেছেন, আমি এবং আমার রসূলগণ অবশ্যই বিজয়ী হব। (সূরা মুজাদালাহ ৫৮:২১) এ বিষয়ে এ ছাড়া আরো বহু আয়াত রয়েছে।

আরও ইরশাদ হয়েছে,

আল-জ্বিন : আয়াত **১৩**

وَّ اَنَّا لَمَّا سَمِعۡنَا الۡہُدٰۤی اٰمَنَّا بِہٖ ؕ فَمَنۡ یُّؤۡمِنۡۢ بِرَبِّہٖ فَلَا یَخَافُ بَخۡسًا وَّ لَا رَہَقًا﴿۱۳﴾

অর্থ :

‘আর নিশ্চয় আমরা যখন হিদায়াতের বাণী শুনলাম, তখন তার প্রতি ঈমান আনলাম। আর যে তার রবের প্রতি ঈমান আনে, সে না কোন ক্ষতির আশংকা করবে এবং না কোন অন্যায়ের’।

অর্থাৎ, না এই আশঙ্কা আছে যে, তাদের সৎকর্মসমূহের প্রতিদানে কোন কমি করা হবে, আর না এই ভয় আছে যে, তাদের অসৎকর্মসমূহকে বর্ধিত করা হবে।

৭) আপনার পাপের তুলনায় আল্লাহর দয়া ও ক্ষমা অনেক বেশি—এ কথাটি কখনও ভুলে যাবেন না:

সুতরাং ক্ষমা প্রার্থনা করুন। আল্লাহ তাআলা বলছেন, ‘নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক অপরিসীম ক্ষমাশীল।’(সুরা নাজম: ৩২) তওবাকারীদের সম্পর্কে রাসুলুল্লাহ (স.) বলেছেন, ‘তোমাদের কেউ মরুভূমিতে হারিয়ে যাওয়া উট খুঁজে পেয়ে যতটা খুশি হও, আল্লাহ তাআলা তার বান্দার তাওবাতে এরচেয়েও বেশি খুশি হন।’ (বুখারি: ৬৭০৯)

৮) বিশ্বাস রাখুন—আপনি যদি খাঁটি মুমিন হয়ে থাকেন দিনশেষে আপনিই হবেন বিজয়ী:

আল্লাহ তাআলা বলেন,

আল-ইমরান : আয়াত ১৩৯

وَ لَا تَہِنُوۡا وَ لَا تَحۡزَنُوۡا وَ اَنۡتُمُ الۡاَعۡلَوۡنَ اِنۡ کُنۡتُمۡ مُّؤۡمِنِیۡنَ﴿۱۳۹﴾

অর্থ :

আর তোমরা দুর্বল হয়ো না এবং দুঃখিত হয়ো না, আর তোমরাই বিজয়ী যদি মুমিন হও।

বিগত যুদ্ধে তোমাদের যে ক্ষতি হয়েছে তার জন্য দমে যেও না এবং দুঃখও করো না। কেননা, তোমাদের মধ্যে যদি ঈমানী শক্তি বিদ্যমান থাকে, তাহলে তোমরাই হবে বিজয়ী এবং তোমরাই লাভ করবে সফলতা। এখানে মহান আল্লাহ মুসলিমদের শক্তির প্রকৃত উৎস এবং তাঁদের সফলতার মূল ভিত্তি কোথায়, সে কথা পরিষ্কার করে দিলেন। তাই তো এর পর যত যুদ্ধ হয়েছে, সেই সমূহ যুদ্ধে মুসলিমরা জয়লাভ করেছেন।

রাসুলুল্লাহ (স.) বলেন, ‘মুমিনের বিষয়টি কতইনা চমৎকার! তার জন্য কল্যাণ ছাড়া আর কিছুই নেই। তার জন্য যদি কোনো খুশির ব্যাপার হয় এবং সে কৃতজ্ঞতা আদায় করে তাহলে সেটি তার জন্য কল্যাণকর। আর যদি কোনো দুঃখের বিষয় হয় এবং সে ধৈর্য ধারণ করে, সেটিও তার জন্য কল্যাণকর।’ (সহিহ মুসলিম: ২৯৯৯)

৯) আপনার রিজিক মানুষের হাতে নয়- এই ব্যাপারে নিশ্চিত থাকুন এবং নির্ভয়ে কাজ করে যান:

ঈমান রাখুন এই বাক্যে—

আয-যারিয়াত : আয়াত ২২

وَ فِی السَّمَآءِ رِزۡقُکُمۡ وَ مَا تُوۡعَدُوۡنَ﴿۲۲﴾

অর্থ :

আকাশে রয়েছে তোমাদের রিযক ও প্রতিশ্রুত সব কিছু।

অর্থাৎ, বৃষ্টিও আকাশ থেকে হয়, (সূর্যও আছে আকাশে,) যার দ্বারা তোমাদের জীবিকা উৎপন্ন হয়। আর জান্নাত ও জাহান্নাম এবং প্রতিদান ও শাস্তির ব্যাপারটাও আসমানে আছে, যার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে।

আরও ইরশাদ হয়েছে, ‘‘যমীনে বিচরণকারী যত প্রাণী আছে, সকলের রিযিকের দায়িত্ব আল্লাহর ওপর এবং তিনি জানেন, তাদের দীর্ঘকালীন বাসস্থান ও স্বল্পকালীন অবস্থানের জায়গা। এবং সব কিছু সুস্পষ্ট কিতাবে বিদ্যমান। ‘‘ অর্থাৎ আল্লাহ স্বীয় অনুগ্রহে ওদের রিযিক নিজের দায়িত্বে রেখেছেন।

১০) ভালো কাজে ব্যস্ত থাকুন, কেননা অলস সময় নিকৃষ্ট শত্রু:

আল্লাহ তাআলা বলছেন,

আল-ইনশিরাহ : আয়াত ৭

فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ﴿٧﴾

অর্থ :

অতএব যখনই তুমি অবসর পাবে, তখনই কঠোর ইবাদাতে রত হও। অর্থাৎ, নামায, তাবলীগ, অথবা জিহাদ থেকে যখনই অবসর পাও তখনই ইবাদত (দু'আ ও যিকরে)র জন্য সচেষ্ট হও। (যেহেতু ইবাদতের পর যিকরই বিধেয়।) অথবা এত বেশী আল্লাহর ইবাদত কর, যাতে তুমি ক্লান্ত হয়ে পড়।

১১) কারো ওপর তীব্র বিরক্তি ও ক্রোধ থাকলে এখনই ঝেড়ে ফেলুন:

কেননা তা আপনাকেই বেশি ভোগাবে। এই প্রার্থনা করুন,

আল-হাশর : আয়াত ১০

وَ الَّذِيْنَ جَآءُوْ مِنْۢ بَعْدِہِمْ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَ لِاِخْوَانِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُوْنَا بِالْاِيْمَانِ وَ لَا تَجْعَلْ فِيْ قُلُوْبِنَا غِلًّا لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا رَبَّنَاۤ اِنَّكَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ﴿١٠﴾

অর্থ :

যারা তাদের পরে এসেছে তারা বলে: ‘হে আমাদের রব, আমাদেরকে ও আমাদের ভাই যারা ঈমান নিয়ে আমাদের পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে তাদেরকে ক্ষমা করুন;

এবং যারা ঈমান এনেছিল তাদের জন্য আমাদের অন্তরে কোন বিদ্বেষ রাখবেন না; হে আমাদের রব, নিশ্চয় আপনি দয়াবান, পরম দয়ালু।

এরা হল 'মালে ফাই' পাওয়ার তৃতীয় অধিকারী দল। অর্থাৎ, সাহাবীদের পর আগত এবং তাঁদের অনুসরণকারী। এতে তাবেঈন, তাবে-তাবেঈন এবং কিয়ামত পর্যন্ত আগত সকল ঈমানদার ও আল্লাহভীরু শামিল। তবে শর্ত হল, তাদেরকে আনসার ও মুহাজিরদেরকে মু'মিন জেনে তাঁদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনাকারী হতে হবে। তাঁদের ঈমানে সন্দেহ পোষণকারী, তাঁদেরকে গালি-মন্দকারী এবং তাঁদের বিরুদ্ধে নিজেদের অন্তরে বিদ্বেষ ও শত্রুতা পোষণকারী হলে হবে না। ইমাম মালেক (রঃ) এই আয়াত থেকেই তথ্য সংগ্রহ করে বলেছেন যে, 'রাফেযী (শিয়া), যে সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ)-দেরকে গাল-মন্দ করে, সে 'মালে ফাই' থেকে কোন অংশ পাবে না। কেননা, মহান আল্লাহ সাহাবীদের প্রশংসা করেছেন, কিন্তু রাফেযী তাঁদের নিন্দা গেয়ে বেড়ায়। (ইবনে কাসীর) আয়েশা (রাঃ) বলেন, তোমাদেরকে মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর সাহাবীদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, কিন্তু তোমরা তাঁদেরকে গালি দিলে! আমি তোমাদের নবীকে বলতে শুনেছি যে, "এই জাতি ততক্ষণ পর্যন্ত ধ্বংস হবে না, যতক্ষণ না তাদের পরবর্তী লোকেরা পূর্ববর্তী লোকেদেরকে অভিসম্পাত করবে।" (বাগবী)

১২) আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল করুন:

এটিকে বলা হয় সুখী হওয়ার পরশপাথর। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন, আত-ত্বালাক : আয়াত ৩

وَّ يَرۡزُقۡهُ مِنۡ حَيۡثُ لَا يَحۡتَسِبُ ؕ وَ مَنۡ يَّتَوَكَّلۡ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسۡبُهٗ ؕ اِنَّ اللّٰهَ بَالِغُ
اَمۡرِهٖ ؕ قَدۡ جَعَلَ اللّٰهُ لِكُلِّ شَىۡءٍ قَدۡرًا﴿۳﴾

অর্থ :

এবং তিনি তাকে এমন উৎস থেকে রিযক দিবেন যা সে কল্পনাও করতে পারবে না। আর যে আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল করে আল্লাহ তার জন্য যথেষ্ট। আল্লাহ তাঁর উদ্দেশ্য পূর্ণ করবেনই। নিশ্চয় আল্লাহ প্রত্যেক জিনিসের জন্য একটি সময়সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছেন।

অর্থাৎ, তিনি যা করতে চান, তা থেকে তাঁকে কেউ বাধা দিতে পারে না।

কষ্টসাধ্য ও সহজসাধ্য সকল কর্মের জন্যই। নির্ধারিত সময়েই উভয় (সহজ ও কঠিন) জিনিসেরই পরিসমাপ্তি ঘটে। কেউ কেউ এর অর্থ নিয়েছেন, মাসিক ও ইদ্দত।

হাদিসে কুদসিতে আল্লাহ তাআলা ঘোষণা করেন- 'আমি সেরূপ, যেরূপ বান্দা আমার প্রতি ধারণা রাখে।' (সহিহ মুসলিম: ২/৩৪১)

১৩) তাকদিরের ওপর পূর্ণ বিশ্বাস রাখুন:

দুঃখ-হতাশা, অভাব-অনটন, বিপদ-আপদে তাকদিরের উপর বিশ্বাস থাকলে কোনো মানুষই মানসিক চাপে ভোগে না। তাকদিরের ওপর সবকিছু ছেড়ে দেওয়ায় রয়েছে মানসিক প্রশান্তি। আল্লাহ তাআলা বলেন,

ইউনুস : আয়াত ১০৭

وَ اِنۡ یَّمۡسَسۡکَ اللّٰہُ بِضُرٍّ فَلَا کَاشِفَ لَہٗۤ اِلَّا ہُوَ ۚ وَ اِنۡ یُّرِدۡکَ بِخَیۡرٍ فَلَا رَآدَّ لِفَضۡلِہٖ ؕ
یُصِیۡبُ بِہٖ مَنۡ یَّشَآءُ مِنۡ عِبَادِہٖ ؕ وَ ہُوَ الۡغَفُوۡرُ الرَّحِیۡمُ ﴿۱۰۷﴾

অর্থ :

‘আর আল্লাহ যদি তোমাকে কোন ক্ষতি পৌঁছান, তবে তিনি ছাড়া তা দূর করার কেউ নেই। আর তিনি যদি তোমার কল্যাণ চান, তবে তাঁর অনুগ্রহের কোন প্রতিরোধকারী নেই। তিনি তার বান্দাদের যাকে ইচ্ছা তাকে তা দেন। আর তিনি পরম ক্ষমাশীল, অতি দয়ালু’।

মঙ্গল বা উত্তম বস্তুকে এখানে এই জন্য 'ফাফ্ল' বা অনুগ্রহ বলেছেন যে, আল্লাহ তাআলা স্বীয় বান্দার সাথে যে ভাল ব্যবহার করে থাকেন, আমলের দিক থেকে যদিও বান্দা তার অধিকারী নয়; তবুও এটা তাঁর অনুগ্রহ বা দয়া যে, তিনি মানুষের আমল না দেখে তার উপর রহম ও দয়া করে থাকেন।
আরও ইরশাদ হয়েছে,

আল-হাদিদ : আয়াত ২২

مَاۤ اَصَابَ مِنۡ مُّصِیۡبَۃٍ فِی الۡاَرۡضِ وَ لَا فِیۡۤ اَنۡفُسِکُمۡ اِلَّا فِیۡ کِتٰبٍ مِّنۡ قَبۡلِ اَنۡ نَّبۡرَاَہَا ؕ اِنَّ ذٰلِکَ عَلَی اللّٰہِ یَسِیۡرٌ ﴿۲۲﴾ۚۖ

অর্থ :

যমীনে এবং তোমাদের নিজদের মধ্যে এমন কোন মুসীবত আপতিত হয় না, যা আমি সংঘটিত করার পূর্বে কিতাবে লিপিবদ্ধ রাখি না। নিশ্চয় এটা আল্লাহর পক্ষে খুবই সহজ।

যেমন দুর্ভিক্ষ, প্লাবন, ঝড়-তুফান এবং অন্যান্য আকাশ ও পৃথিবীর বিপদাপদ।

যেমন, রোগ-ব্যাধি, কষ্ট-ক্লেশ এবং অভাব-অনটন ইত্যাদি।

মহান আল্লাহ তাঁর জ্ঞানানুসারে সমস্ত সৃষ্টিকে সৃষ্টি করার পূর্বেই যাবতীয় বিষয়াদি লিখে দিয়েছেন।

যেমন, হাদীসে আছে, নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, "মহান আল্লাহ আকাশ-পৃথিবী সৃষ্টি করার পঞ্চাশ হাজার বছর পূর্বেই সৃষ্টি ভাগ্য লিখে দিয়েছেন।" (মুসলিমঃ তাকদীর অধ্যায়)

১৪) নামাজ আদায় করা প্রশান্তিলাভের অন্যতম মাধ্যম

রাসুল (স.) বলতেন, ‘হে বিলাল, (আজানের মাধ্যমে) নামাজ কায়েম করো। আমরা নামাজের মাধ্যমে প্রশান্তি লাভ করো।’ (আবু দাউদ: ৪৯৮৫-৪৯৮৬)

১৫) কোরআন তেলাওয়াত করুন:

রাসুল (স.) কোরআন পাঠের মাধ্যমে প্রশান্তি অনুভব করতেন। তিনি এভাবে দোয়া করতেন—اللَّهُم ّ َإِنِّي َأَسْأَلُك َأَن ْتَجْعَل َالقُرْآن َرَبِيع َقَلْبِي، وَنُور َ

صَدْرِي، وَجَلاَءَ حُزْنِي، وَذَهَاب هَمِّي ‘হে আল্লাহ, তোমার কাছে চাই, যেন তুমি কোরআনকে করে দাও আমার হৃদয়ের বসন্ত (আগ্রহ-ভালোবাসা); আমার বক্ষের জন্য আলো; আমার দুশ্চিন্তার নির্বাসন এবং আমার পেরেশানি দূরকারী। (মুসনাদ আহমদ: ৩৭১২; সিলসিলা সহিহাহ: ১৯৯)

প্রত্যহ জীবনে সুখ লাভের জন্য এগুলো আমাদের সবার প্রয়োজন। বারবার প্রয়োজন। আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে হায়াতে তাইয়েবা দান করুন। সুখী জীবন দান করুন। আমিন।

আল কুরআনে আল্লাহ আয ওয়াজ্জা ইরশাদ করেছেন-

আর-রাদ : আয়াত **১১**

لَہٗ مُعَقِّبٰتٌ مِّنۡۢ بَیۡنِ یَدَیۡہِ وَ مِنۡ خَلۡفِہٖ یَحۡفَظُوۡنَہٗ مِنۡ اَمۡرِ اللّٰہِ ؕ اِنَّ اللّٰہَ لَا یُغَیِّرُ مَا بِقَوۡمٍ حَتّٰی یُغَیِّرُوۡا مَا بِاَنۡفُسِہِمۡ ؕ وَ اِذَاۤ اَرَادَ اللّٰہُ بِقَوۡمٍ سُوۡٓءًا فَلَا مَرَدَّ لَہٗ ۚ وَ مَا لَہُمۡ مِّنۡ دُوۡنِہٖ مِنۡ وَّالٍ ﴿۱۱﴾

অর্থ :

মানুষের জন্য রয়েছে, সামনে ও পেছনে, একের পর এক আগমনকারী প্রহরী, যারা আল্লাহর নির্দেশে তাকে হেফাযত করে। নিশ্চয় আল্লাহ কোন কওমের অবস্থা ততক্ষণ পরিবর্তন করেন না, যতক্ষণ না তারা নিজেদের অবস্থা পরিবর্তন করে। আর যখন আল্লাহ কোন জাতির মন্দ চান, তখন তা প্রতিহত করা যায় না এবং তাদের জন্য তিনি ছাড়া কোন অভিভাবক নেই।

মানুষের জন্য তার সামনে ও পেছনে একের পর এক প্রহরী থাকে; ওরা আল্লাহর আদেশে তার রক্ষণাবেক্ষণ করে।অর্থাৎ প্রত্যেক বান্দার জন্য আল্লাহ ফেরেশতা নিযুক্ত করেছেন। যাঁদের মধ্যে কেউ কেউ তার আগের ও পরের সব আমল

লিপিবদ্ধ করেন, কেউ কেউ আল্লাহর হুকুমে সেই সব বিপদ দূর করার মাধ্যম হন, যেগুলো থেকে আল্লাহ তাঁর বান্দাকে রক্ষা করতে চান।

নিশ্চয় আল্লাহ কোন সম্প্রদায়ের অবস্থা পরিবর্তন করেন না; যতক্ষণ না তারা নিজেদের অবস্থা নিজেরা পরিবর্তন করে।

আর কোন সম্প্রদায়ের সম্পর্কে যদি আল্লাহ অশুভ কিছু ইচ্ছা করেন তাহলে তা রদ করবার কেউ নেই এবং তিনি ছাড়া তাদের কোন অভিভাবক নেই।

অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার তরফ থেকে সর্বদা যে মেহেরবানী ও রক্ষনাবেক্ষণ হতে থাকে, তা থেকে তিনি কাউকে বন্চিত / মাহরূম করেন না। ততক্ষন যতক্ষন পর্যন্ত মানুষ আল্লাহর সাথে তাদের সম্পর্ককে দৃঢ় রাখে আল্লাহর হুকুম আহকাম পালনের মাধ্যমে। যখন তারা তাদের আচরণ পরিবর্তন করে, তখন বিপদ আপদ এসে পড়লে কেউ তা রোধ করতে পারে না।কারো সাহায্যও তখন কোন কাজে আসে না।

مُعَقِّبَاتٌ শব্দটি مُعَقِّبَةٌ শব্দের বহুবচন, এর অর্থ এক অপরের পিছে আগমনকারী। অর্থাৎ ফিরিশতাবর্গ যাঁরা পালাক্রমে এক অপরের পরে আসতে থাকেন। দিনের ফিরিশতা গেলে রাতের ফিরিশতা আসেন এবং রাতের ফিরিশতা গেলে দিনের ফিরিশতা আসেন।

দু:খের পর আসে স্বস্তি :

মানুষের জন্য সবচেয়ে বড় সাফল্য আল্লাহ রব্বুল আ'লামিন এর হুকুম আহকাম পালনের মাধ্যমে তাঁর নিকটবর্তী হওয়ার চেষ্টা করে। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন -

আল-ইনশিরাহ : আয়াত ৬

اِنَّ مَعَ الۡعُسۡرِ يُسۡرًا ؕ﴿۶﴾

অর্থ :

নিশ্চয় কষ্টের সাথেই রয়েছে সুখ।

এ হল নবী (সাঃ) ও তাঁর সাহাবাগণের জন্য শুভসংবাদ যে, তোমরা ইসলামের পথে যা কিছু দুঃখ-কষ্ট সহ্য করছ এ ব্যাপারে চিন্তিত হওয়ার কোন প্রয়োজন নেই; যেহেতু এর পরেই আল্লাহ তাআলা তোমাদের জন্য অবসর ও স্বস্তি এনে দেবেন। সুতরাং এইরূপই হয়েছিল; যা সারা পৃথিবীর লোকেরা অবগত।

আল্লাহ পাক আবারো বলেছেন-

আল-ইনশিরাহ : আয়াত ৭

فَاِذَا فَرَغۡتَ فَانۡصَبۡ ۙ﴿۷﴾

অর্থ :

অতএব যখনই তুমি অবসর পাবে, তখনই কঠোর ইবাদাতে রত হও।

অর্থাৎ, নামায, তাবলীগ, অথবা জিহাদ থেকে যখনই অবসর পাও তখনই ইবাদত (দু'আ ও যিকরে)র জন্য সচেষ্ট হও। (যেহেতু ইবাদতের পর যিকরই বিধেয়।) অথবা এত বেশী আল্লাহর ইবাদত কর, যাতে তুমি ক্লান্ত হয়ে পড়।

মূল বিষয়

কষ্টের সাথে স্বস্তি: এই আয়াতটি শুধু কষ্টের *পরে* স্বস্তি আসার কথা বলে না, বরং এটি বোঝায় যে কষ্ট থাকা অবস্থাতেই স্বস্তিও বিদ্যমান। অর্থাৎ, কষ্ট ও স্বস্তি একে অপরের সাথে জড়িত।

ধৈর্য ও আশা: এই আয়াতটি মানুষকে দুঃখ-কষ্টের সময় ধৈর্য ধরতে এবং আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা রাখতে উৎসাহিত করে।

আল্লাহর প্রতিশ্রুতি: আল্লাহ তাঁর বান্দাদের প্রতি প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, যত কষ্টই আসুক না কেন, তার সাথে স্বস্তিও থাকবে।

পরবর্তী নির্দেশনা: এরপরের আয়াতে (৭ নং আয়াত) বলা হয়েছে, "অতএব, যখন অবসর পান, তখন ইবাদত ও পরিশ্রম করুন এবং আপনার পালনকর্তার প্রতি মনোনিবেশ করুন"। এটি বুঝায় যে, কষ্টের সময় শেষ হলে আল্লাহর প্রতি আরো বেশি নিবেদিত হওয়া উচিত।

সুবহানাল্লাহ।

ড: আইদ আল ক্বরনী তার “লা তাহযান” বইয়ে লিখেছেন,

আরামে, শান্তিতে ও সুস্থ থাকাকালে প্রায়ই প্রার্থনা করুন। মুমিনের চরিত্র হলো যে, সে শোকরগুজার ও পাকা নিয়তকারী (কৃতজ্ঞ ও স্থির সঙ্কল্প)। সে ধনুক তীর থেকে নিক্ষেপ করার আগেই ওটাকে ধার দিয়ে নেয় এবং মুসিবতে পড়ার (দুর্দশাগ্রস্ত হবার) আগেই সে আল্লাহর মুখাপেক্ষী হয়। এ বিষয়ে মু’মিনদের বিপরীত হলো ইতর কাফের ও অবিবেচক (বোকা) মু’মিন।

“আর যখন মানুষকে কোন ক্ষতি স্পর্শ করে তখন সে বিনীতভাবে বা একনিষ্ঠভাবে তার প্রভুকে ডাকে; অতঃপর যখন তিনি তার পক্ষ থেকে তাকে কোন নেয়ামত দান করেন, তখন সে যে আগে তার নিকট আবেদন করত সে কথা সে ভুলে যায় এবং সে আল্লাহর সমকক্ষ দাঁড় করায়।” (৩৯-সূরা আয যুমারঃ আয়াত-৮)

অতএব, যদি আমরা সত্যিই নিরাপদ থাকতে চাই তবে আল্লাহর নিকট আবেদন (দোয়া) করায় এবং আল্লাহর প্রশংসায় আমাদেরকে অবশ্যই অটল থাকতে হবে। স্বাচ্ছন্দ্যের বা সুখের সময় আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করার উদ্দেশ্য হলো (ইমাম হালীমির মতে): আল্লাহর প্রশংসা করা, তার শোকরিয়া আদায় করা ও তার অগণিত করুণাকে অনুধাবন করা এবং একই সময়ে হেদায়েত ও সাহায্য চাওয়া। আপনার ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্য ক্ষমা চাওয়াও জরুরি। আল্লাহর যে হক আপনার উপর আছে আপনি যতই চেষ্টা করুন না কেন তা আপনি কিছুতেই পুরাপুরিভাবে সম্পন্ন করতে পারবেন না (এ কারণেই ক্ষমা ভিক্ষা চাওয়া জরুরি। -অনুবাদক)

নিরুদ্বিগ্ন ও নিরাপদ অবস্থায় যে ব্যক্তি সে অধিকার সম্বন্ধে অমনোযোগী থাকে সে নিম্নোক্ত আয়াতের মধ্যে উল্লেখিত লোকদের দলে পড়ে-

فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ

“আর যখন তারা নৌযানে চড়ে তারা আল্লাহর প্রতি তাদের বিশ্বাসকে খাটি করে তাকে ডাকে, কিন্তু যখনই তিনি তাদেরকে স্থলভাগে উত্তীর্ণ করেন তখনই তারা আল্লাহর সাথে শরীক সাব্যস্ত করে।” (২৯-সূরা আনকাবূতঃ আয়াত-৬৫)

তিনি তার বইয়ে আরো উল্লেখ করেছেন যে ‘ জীবনকে স্বাভাবিকভাবে নিতে’: জীবনের আনন্দ খুবই ক্ষণস্থায়ী এবং প্রায়ই তার পরে দুঃখ নেমে আসে। জীবনের অর্থই হলো দায়িত্ব, সতত পরিবর্তনশীল যাত্রা ও দুঃখ-কষ্টের অবিরাম নির্মম প্রচণ্ড আক্রমণ ।

আপনি এমন একজন পিতা, স্ত্রী বা বন্ধু পাবেন না যিনি সমস্যামুক্ত। আল্লাহ তা'আলা চেয়েছেন যে, এ পৃথিবীর দুটি করে বিপরীত জিনিস দিয়ে ভরপুর থাক। যেমন- ভালো-মন্দ, পাপ-পুণ্য, সুখ-দুঃখ। অতঃপর ভালোত্ব, সততা-সরলতা ও সুখ স্বর্গের (জান্নাতের) জন্য; মন্দকাজ, দুর্নীতি ও পাপকাজ এবং দুঃখ-দুর্দশা নরকের (জাহান্নামের) জন্য।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

الدُّنْيَا مَلْعُونَةٌ مَلْعُونٌ مَا فِيهَا إِلَّا ذِكْرُ اللَّهِ وَمَا وَالَاهُ وَعَالِماً و مُتَعَلِّماً

"আল্লাহর জিকির ও জিকিরের ফলে যা আসে (যেমন ভালো কাজ, আল্লাহ যা ভালোবাসেন) তা এবং আলেম ও তালেবে এলম ছাড়া গোটা দুনিয়া ও দুনিয়াতে যা কিছু আছে সবই অভিশপ্ত।"

এক নিখুঁত, আদর্শ, দুশ্চিন্তা ও কষ্টহীন কল্পিত ইহজীবনের (কল্পিত ইহকালীন স্বর্গরাজ্যের) আশায় বৃথা ও কষ্ট কল্পনায় সর্বদা বিভোর না থেকে আপনার যা আছে তাই নিয়েই জীবন-যাপন করুন। জীবনকে স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করুন এবং তদানুপাতে সকল পরিবেশের সাথে নিজেকে খাপ খাইয়ে (মানিয়ে) নিন। (সকল পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে নেয়ার অর্থ সকল মতাদর্শ মেনে নেয়া ও তদানুসারে কাজ করা নয়; বরং, নিজে শান্তির ধর্ম মেনে চলা ও অন্যকে তদানুসারে চলতে বলা, যদি তারা না মানে তবে অহেতুক মর্মযাতনাবোধ না করা। -অনুবাদক) নিন। এ দুনিয়াতে আপনি নিষ্কলঙ্ক সঙ্গী ও নিখুঁত পরিস্থিতি বলে কোন জিনিস পাবেন না; কেননা, নিষ্কলঙ্কতা ও নিখুঁত অবস্থা এমন দুটি গুণের নাম যা এ জীবনে পরদেশী।

নিজেদেরকে সংশোধন করা, সহজটাকে গ্রহণ করা, কঠিনটাকে বর্জন করা এবং প্রায়ই অন্যের ভুল-ভ্রান্তিকে উপেক্ষা করা আমাদের জন্য জরুরি।

ধার্মিক ব্যক্তিরা কি আসলেই বেশি সুখী?

বিভিন্ন গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে যে, গড়পড়তায় ধার্মিক মানুষেরা ধর্মকর্মহীন মানুষদের চেয়ে বেশি সুখী বা সন্তুষ্ট, শোকর গুজারী । আবার ধার্মিক নন, এমন মানুষদের সুখ সাময়িক বা অল্পস্থায়ী, সেই তুলনায় ধার্মিক লোকেদের সুখবোধ গভীর এবং দীর্ঘস্থায়ী। অদ্ভুত না!

আমার ধারণা, ধার্মিক মানুষেরা বিশ্বাস করে যে, আমাদের জীবনে ঘটে যাওয়া প্রতিটি বিষয়ের পিছনেই কোনো অন্তর্নিহিত অর্থ ও উদ্দেশ্য আছে। আর ইসলামের চেয়ে বেশি আর কোন ধর্ম জীবন, দুঃখ, ও কষ্টের ব্যপারে অর্থবহ সংজ্ঞা দেয়?

জীবনের পরীক্ষার সবচেয়ে বড় উদ্দেশ্য হলো আমাদের আল্লাহর নিকটবর্তী করা। কাজেই আপনি যখন কষ্টের সময় অতিবাহিত করছেন, আপনি আল্লাহর আরও নিকটবর্তী হচ্ছেন। আর যখন কষ্ট শেষে স্বস্তি আসে, তখন আরো বেশি আল্লাহর নৈকট্য অনুভব করবেন।

আপনার আশেপাশেই ঠিক এই ব্যাপারটা দেখতে পাবেন। কিছু কিছু ভাই-বোনকে কল্পনাতীত কষ্ট ভোগ করতে দেখা যায়, কেউ কেউ অসহনীয় যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে যান। তাঁদের কেউ কেউ এমন দৃষ্টান্ত স্থাপনকারী ধৈর্যধারণ করেন যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁদের সবরের পুরষ্কারস্বরূপ তাঁদের অন্তরে শান্তি ঢেলে দেন।

وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ

"আর আমি আপনার থেকে বোঝাকে (দুশ্চিন্তাকে) দূর করে দিয়েছি, যা আপনার পিঠ ভেঙ্গে দিয়েছিল (অর্থাৎ যা আপনার জন্য খুব কষ্টকর ছিল।)"

وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا

"এবং আপনার উপর আল্লাহর অনুগ্রহ খুবই মহান।" (৪-সূরা আন নিসাঃ আয়াত-১১৩)

اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ

"আল্লাহ ভালোই জানেন কাকে তার রিসালাত দিবেন।" (৬-সূরা আন'আমঃ আয়াত-১২৪)

একটি নির্ভরযোগ্য হাদীসে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

الْبِرُّ حُسْنُ الْخُلُقِ وَالإِثْمُ مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ وَكَرِهْتَ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ

"উত্তম চরিত্রই পুণ্য আর তোমার বিবেক যে কাজে বাধা দেয় এবং মানুষ তা জানুক তা তুমি পছন্দ কর না তাই পাপ।"

মানুষ নেক আমল করতে সক্ষম হ'লেও পাপাচার বর্জনে অনেক ক্ষেত্রে অক্ষম হয়ে যায়। অথচ এমন অনেক পাপ আছে, যা মানুষের আমল বিনষ্ট ও নিষ্ফল করে দেয়। এতে সে পরকালে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাই নেকী অর্জনের পাশাপাশি পাপ বর্জনের সর্বাত্মক চেষ্টা করতে হবে। কেননা এটা অনেক নফল ইবাদত অপেক্ষা উত্তম। আব্দুল্লাহ ইবনে আববাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, জনৈক ব্যক্তি তাঁকে জিজ্ঞেস করল, أَيُّمَا أَحَبُّ إِلَيْك رَجُلٌ قَلِيلُ الذُّنُوبِ قَلِيلُ الْعَمَلِ، أَوْ رَجُلٌ كَثِيرُ الذُّنُوبِ كَثِيرُ الْعَمَلِ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : لَا أَعْدِلُ بِالسَّلَامَةِ شَيْئًا .

'কোন্ ব্যক্তি আপনার কাছে পসন্দনীয়? যে ব্যক্তি অল্প পাপ করে ও স্বল্প আমল করে সে, নাকি যে ব্যক্তি অধিক পাপ করে ও অধিক আমল করে সে? তিনি বললেন, গোনাহ থেকে নিরাপদ থাকার সমতুল্য আমল আমি কোনটিকে মনে করি না'। হাসান বছরী (রহঃ) বলতেন, مَا عَبَدَ الْعَابِدُونَ بِشَيْءٍ أَفْضَلَ مِنْ تَرْكِ مَا نَهَاهُمُ اللهُ عَنْهُ 'আল্লাহর নিষিদ্ধ বিষয়গুলো থেকে বেঁচে থাকা অপেক্ষা উত্তম ইবাদত কোন ইবাদতকারী করতে পারেনি'।

পাপাচার পরিত্যাগ করা ব্যতীত আল্লাহর প্রিয় বান্দা হওয়া যায় না।

রুজী রোজগার বরকতময় করাও সুখ ও সমৃদ্ধির অন্যতম চাবিকাঠি :

(১) আল্লাহর তাকওয়া মনের মণিকোঠায় সঞ্চিত রাখা একান্ত কর্তব্য । এটি এমন একটি ধনভান্ডার যার বরকতে জীবনের সব কিছু প্রাচুর্যে পরিপূর্ণ হবে। মহান আল্লাহ বলেন, "গ্রামবাসীরা যদি ঈমান আনত এবং মুত্তাকী হত, তাহলে তাদের উপর আকাশ ও পৃথিবীর বরকতসমুহের দরজা খুলে দিতাম।" (সূরা আ'রাফ ৯৬ আরাত)

তিনি আরো বলেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তার জন্য উদ্ধারের পথ সহজ করে দেন এবং এমন জায়গা থেকে তাকে রুযী দান করেন, যে জায়গা থেকে রুযী আসার কথা সে কল্পনাও করতে পারত না। (সুরা তালাক ২-৩ আয়াত)

(২) আল্লাহর উপর যথার্থ আস্থা ও ভরসা রাখা। "আর যে আল্লাহর উপর ভরসা রাখে,তিনিই তার জন্য যথেষ্ট হন।" (সুরা তালাক ৩ নং আয়াত) মহানবী সা: বলেন, "তোমরা যদি যথার্থরূপে আল্লাহর উপর ভরসা রাখ, তাহলে ঠিক সেই রকম রুযী পাবে, যে রকম পাখীরা রুযী পেয়ে থাকে; সকাল বেলায় খালি পেটে বের হয়ে যায় এবং সন্ধ্যা বেলায় ভরা পেটে বাসায় ফিরে।" (আহমাদ)

(৩) অভাব পড়লে মাথা উচু রাখ এবং আল্লাহর কাছে তোমার অভাবের কথা জানাও কোন মানুষের কাছে নয়। মহানবী হযরত মুহাম্মদ সা: বলেন, "যার অভাব আসে, সে যদি তা মানুষের কাছে (পুরণের কথা) জানায়, তাহলে তার অভাব দূর হয় না। কিন্ত যার অভাব আসে, সে যদি তা আল্লাহর কাছে (পূরণের কথা) জানায়, তাহলে তিনি বিলম্বে দূর করে দেন।" (তিরমিযী)

অথবা অবিলম্বে তার অভাব দূর করে দেন।

(৪) নিয়মিত কুরআন তিলাওয়াত করা; কুরআন হল বরকতময় নিয়ামত।

(৫) নিয়মিত দু'আতে বরকত প্রার্থনা করা, অপরকে দান করো তার কাছে রুযীতে বরকতের নিয়তে।

(৬) নিয়মিত ইস্তিগফার (আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা) করতে থাকা। কারণ, তাতে রুযীতে বরকত আসে। মহান আল্লাহ হযরত নূহ আ:-এর কথা উল্লেখ করে বলেন, "আমি তাদেরকে বললাম, তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা (ইস্তিগফার) কর। তিনি তো মহা ক্ষমাশীল। তিনি তোমাদের জন্য প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টিপাত করবেন। তিনি তোমাদেরকে ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দ্বারা সমৃদ্ধ করবেন। আর তোমাদের জন্য দের জন্য বাগান তৈরী করে দিবেন এবং প্রবাহিত করে দিবেন নদী-নালা।" (সুরা নুহ :১০-১২)

(৭) যতটাই রুযী তুমি পাও, যে হালেই তুমি থাক, সর্বহালেই তুমি রুযীদাতার আল্লাহর শুকরিয়া আদায় কর। কারণ, এতে সম্পদ বৃদ্ধি হয়। মহান আল্লাহ এভাবে তাঁর বান্দাদেরকে প্রতিদান দিয়ে থাকেন।" (সুরা আলে ইমরান- ১৪৪)

আল্লাহ বলেন, "নিশ্চয়ই তোমরা কৃতজ্ঞ হলে, আমি অবশ্যই তোমাদের ধন আরো বৃদ্ধি করব। আর অকৃতজ্ঞ হলে আমার আযাব নিশ্চয়ই কঠিন।"

মহান প্রতিপালক আল্লাহ আমাদেরকে কত নেয়ামত দান করেছেন, তা গুনে শেষ করা যায় না। এই সকল নেয়ামতের শুকরিয়া আদায় করা বান্দার জন্য ফরয। শুকর আদায়ের নিয়ম হলো,

প্রথমতঃ অন্তরে এই স্বীকার করা যে, এই নেয়ামত আল্লাহর তরফ থেকে আগত।

দ্বিতীয়তঃ মুখে তার শুকরিয়া আদায় করা।

তৃতীয়তঃ কাজেও শুকরিয়া প্রকাশ করা। অর্থাৎ, সেই নেয়ামত তারই সন্তুষ্টির পথে; গরীব-মিসকীনদের অভাব মোচনের পথে, আল্লাহ্‌র দ্বীনকে প্রতিষ্ঠা করার পথে এবং তার শরীয়তকে বাচিয়ে রাখার পথে খরচ করা। অন্যথা নাশুকরিয়ার কারনে বারাকাহ্ নি:শেষ হয়ে যায়।

(৮) মন থেকে লোভ দুর কর। কারণ, লোভে বরকত বিনাশ হয়। মহানবী সা: হাকীম বিন হিযাম রা:-কে বলেন, "হে হাকীম! এ মাল হল (লোভনীয়) তরতাজা ও সুমিষ্ট জিনিস।সুতরাং যে তা মনের বদান্যতার সাথে গ্রহণ করবে, তার জন্য তাতে বরকত দেওয়া হবে। আর যে তা মনের লোভের সাথে গ্রহণ করবে, তার জন্য তাতে বরকত দেওয়া হবে না। তার অবস্থা হবে সেই ব্যক্তির মত, যে খায় অথচ তৃপ্ত হয় না।" (মুসলিম)

(৯) ব্যবসা বানিজ্যে সততা বজায় রাখা এবং হঠকারিতা বর্জন করলে রুযীতে বরকত লাভ হয়। মহানবী হজরত মুহাম্মদ সা: বলেন,

"ব্যবসায়ী (ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ে) যদি (ক্রয়-বিক্রয়ে) সত্য বলে এবং (পণ্যদ্রব্যের দোষগুণ) খুলে বলে তাহলে তাদের ক্রয়-বিক্রয়ে বরকত দেওয়া হয়। অন্যথা যদি (পণ্যদ্রব্যের দোষ-ত্রুটি) গোপন করে এবং মিথ্যা বলে তাহলে বাহ্যতঃ তারা লাভ করলেও তাদের ক্রয়বিক্রয়ের বরকত বিনাশ করে দেওয়া হয়। আর মিথ্যা কসম পণ্যদ্রব্য চালু করে ঠিকই, কিন্তু তা উপার্জনের বরকত বিনষ্ট করে দেয়।" (বুখারী ২১১৪ মুসলিম ১৫৩২ আবুদাউদ ৩৪৫৯ তিরমিযী ১২৪৬নৎ নাসাঈ)

(১০) সুদ খাওয়া তথা সর্ব প্রকার হারাম উপার্জন বর্জন কর। ব্যাংকের সুদও সুদ। অতএব তাও ত্যাগ কর। কারণ, মহান আল্লাহ বলেন, “আল্লাহ সুদকে নিশ্চিহ্ন করেন এবং দানকে বর্ধিত করেন।” (সূরা বাকারাহ ২৭৬) মহানবী সা: বলেন, “যে ব্যক্তিই বেশী-বেশী সুদ খাবে তারই (মালের) শেষ পরিণাম হবে অল্পতা।” (ইবনে মাজাহ ২২৭৯, হাকেম ২/৩৭ সহীহ ইবনে মাজাহ ১৮৪৮নও) সুদখোর সুদ খেয়ে তার মালের পরিমাণ যত বেশীই করুক না কেন, পরিণামে তা কম হতে বাধ্য। আপাতদৃষ্টিতে তা প্রচুর মনে হলেও বাস্তবে তার কোন মান ও বরকত থাকবে না। এ শাস্তি হবে আল্লাহর তরফ থেকে।”

(১১) সকাল সকাল কাজ শুরু। ফজরের পর সকালের মাঝে বরকত আছে। নবী সা: বলেন, “হে আল্লাহ! তুমি আমার উম্মতের প্রত্যুষে বরকত দাও।” আর তিনি কোন সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করলে সকাল-সকাল প্রেরণ করতেন। সাহাবী একজন ব্যবসায়ী ছিলেন। তিনিও সকাল-সকাল ব্যবসায় (লোক) পাঠাতেন। ফলে তিনি ধনবান হয়েছিলেন এবং তার মাল-ধন হয়েছিল প্রচুর। (আব দাউদ /তীরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ)

(১২) খাবারে বরকত পেতে সুন্নাহ অনুযায়ী খাও। মহানবী সা: বলেন, “খাবারের মধ্যভাগে বরকত নামে। অতএব তোমরা মাঝখান থেকে খেয়ো না।” (বোখারী)

(১৩) তোমার কাছে যেটুকুই মাল আছে, তা থেকে কিছু করে দান কর। আর মোটেই কার্পণ্য করো না। কারণ, দানে মাল বরকত লাভ করে এবং কার্পণ্যে মাল ধ্বংস হয়। মহান আল্লাহ বলেন, “তোমরা যা (আল্লাহর পথে) খরচ কর, আল্লাহ তার স্থলে আরো প্রদান করে থাকেন।” (সূরা সাবা ৩৯ আয়াত) আল্লাহ

বলেন, “হে আদম সন্তান! "তুমি (অভাবীকে) দান কর আমি তোমাকে দান করব।” (মুসলিম ৯৯৩ নং)
নবী সা: বলেন “বান্দা প্রত্যহ প্রভাতে উপনীত হলেই দুই ফিরিস্তা (আসমান হতে) অবতরণ করে ওদের একজন বলেন, "হে আল্লাহ! তুমি দানশীলকে প্রতিদান দাও।” আর দ্বিতীয়জন বলেন, "হে আল্লাহ! তুমি কৃপণকে ধ্বংস দাও।”
“যে ব্যক্তি (তার) বৈধ উপায়ে উপার্জিত অর্থ থেকে একটি খেজুর পরিমাণও কিছু দান করে - আর আল্লাহ তো বৈধ অর্থ ছাড়া অন্য কিছু গ্রহণই করেন না - সে ব্যক্তির এ দানকে আল্লাহ ডান হাতে গ্রহণ করেন। অতঃপর তা এ ব্যক্তির জন্য লালন-পালন করেন যেমন তোমাদের কেউ তার অশ্ব-শাবককে লালন-পালন করে থাকে। পরিশেষে তা পাহাড়ের মত হয়ে যায়।” (বুখারী১৪১০নং মুসলিম ১০- ১৪নং)

(১৪) ত্বলিবাতুল ইলমকে ইলম ত্বলবে সহায়তা করা।ইলম অনুসন্ধানে তাকে অর্থ দিয়ে সাহায্য করলে রুযীতে বরকত আসে।
তাতেও তোমার শিল্প, বাণিজ্য ও জীবিকা বরকতলাভ করবে। আল্লাহর রসুল সা: -এর যুগে দুই ভাই ছিল। একজন নবী সা:-এর নিকট উপস্থিত হয়ে তার হাদীস ও ইলম্ শিক্ষা করত। অপরজন কোন হাতের কাজ করে অর্থ উপার্জন করত। একদা এই শিল্পী ভাই নবী সা:-এর নিকট হাযির হয়ে অভিযোগ করল যে, তার এই (ত্বলিবে ইলম) ভাই তার শিল্পকাজে কোন প্রকার সহায়তা করে না। তা শুনে তিনি তাকে উত্তরে বললেন, “সম্ভবতঃ তুমি ওরই (ইলম শিক্ষার বরকতে) রুযী পাচ্ছ!” (তিরমিযী ২৩৪৬)

আল্লাহু রাযয়াক, আল্লাহই মহা রুযীদাতা, তুমি তারই কাছে রুযী চাও এবং তার জন্য যথার্থ উপায় অবলম্বন কর। সেই রুযী খেয়ে আল্লাহর ইবাদত কর। তিনি তোমাকে সুখী করবেন।

মুসলিমের জীবনে অন্যতম বড় নিয়ামত আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন

মুসলিম জীবনের সর্বোচ্চ লক্ষ্য হলো আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন। এটি এমন একটি পথ, যা বান্দার হৃদয়ে শান্তি, আত্মায় প্রশান্তি এবং জীবনে সুখ নিয়ে আসে। প্রতিটি পদক্ষেপ যদি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নেওয়া হয়, তবে তা দুনিয়া ও আখেরাতে অপার সাফল্যের দ্বার খুলে দেয়।

তবে এই পথে চলতে গিয়ে মানুষের সন্তুষ্টির সঙ্গে আল্লাহর সন্তুষ্টির দ্বন্দ্ব, নিজের ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষা এবং সমাজের চাপের মতো বিভিন্ন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হয়। আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন একটি জীবনব্যাপী সাধনা। শুধু বড় বড় আমলের মাধ্যমে নয়, বরং ছোট ছোট কাজে খাঁটি নিয়তের মাধ্যমেও তা অর্জন করা যায়।

আল্লাহর সন্তুষ্টি বনাম মানুষের সন্তুষ্টি

আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের পথে একজন মুসলিমকে প্রায়ই মানুষের অসন্তুষ্টির সম্মুখীন হতে হয়। এটি এমন একটি পরীক্ষা, যেখানে বান্দাকে দুনিয়ার স্বার্থ ও আখেরাতের কল্যাণের মধ্যে একটি বেছে নিতে হয়। কোরআনে আল্লাহ বলেন, “দুনিয়ার জীবনের উপকরণ সামান্য, আর আখেরাত তাদের জন্য উত্তম যারা তাকওয়া অবলম্বন করে।” (সুরা নিসা, আয়াত: ৭৭)

রাসুল (সা.) বলেছেন, “যে ব্যক্তি মানুষের অসন্তুষ্টির মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি তালাশ করে, আল্লাহ তাকে মানুষের বোঝা থেকে মুক্তি দেবেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর অসন্তুষ্টির মাধ্যমে মানুষের সন্তুষ্টি তালাশ করে, আল্লাহ তাকে মানুষের ওপর ছেড়ে দেবেন” (তিরমিজি, হাদিস: ২৪১৪)।

আর মানুষের সন্তুষ্টি অস্থায়ী এবং পরিবর্তনশীল, কিন্তু আল্লাহর সন্তুষ্টি চিরস্থায়ী ও সর্বোত্তম।

আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের চ্যালেঞ্জ

আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের পথে বেশ কিছু চ্যালেঞ্জ রয়েছে। পরিবারের মধ্যে এমন চাপ দেখা দিতে পারে যেখানে একজন ব্যক্তি মানুষের সন্তুষ্টির জন্য আল্লাহর অসন্তুষ্টির পথ বেছে নেয়।

এই ধরনের পরিস্থিতি একজন মুসলিমকে আল্লাহর আনুগত্য ও পারিবারিক সম্পর্কের মধ্যে ভারসাম্য খুঁজতে বাধ্য করে। কোরআনে বলা হয়েছে, “ইহুদি ও খ্রিষ্টানরা কখনোই তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হবে না যতক্ষণ না তুমি তাদের ধর্মের অনুসরণ করবে। বল, নিশ্চয়ই আল্লাহর পথই সঠিক পথ” (সুরা বাকারা, আয়াত: ১২০)

নেক আমল করার সময় আমাদের নিজেদের প্রশ্ন করা উচিত, আমরা কি এটি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য করছি, নাকি মানুষের প্রশংসা ও সম্মানের জন্য?
দুনিয়ার জীবনের উপকরণ সামান্য, আর আখেরাত তাদের জন্য উত্তম যারা তাকওয়া অবলম্বন করে।

সুরা নিসা, আয়াত: ৭৭

রাসুল (সা.) বলেছেন, কেয়ামতের দিন তিন ধরনের মানুষের আমল বাতিল বলে গণ্য হবে: যে শহীদ লড়াই করেছে যাতে তাকে সাহসী বলা হয়, যে ব্যক্তি জ্ঞান অর্জন ও শিক্ষা দিয়েছে যাতে তাকে আলেম বলা হয়, এবং যে ব্যক্তি দান করেছে যাতে তাকে দানশীল বলা হয়। এই সব কাজের উদ্দেশ্য ছিল মানুষের প্রশংসা, তাই তা আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না। (সহিহ মুসলিম, হাদিস: ১৯০৫)

আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উপায়

আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য বেশ কিছু উপায় রয়েছে, যা আমাদের জীবনে প্রয়োগ করা যায়:

১. খাঁটি নিয়ত

প্রতিটি কাজে আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করা অপরিহার্য। খাঁটি নিয়ত হৃদয়কে শক্তিশালী করে এবং আল্লাহর কাছ থেকে সাফল্য ও সন্তুষ্টি আকর্ষণ করে।

২. আল্লাহর আদেশে দ্রুত সাড়া দেওয়া

আল্লাহর আদেশ পালনে কোনো অলসতা বা বিলম্ব করা উচিত নয়। মুসা (আ.) বলেছিলেন, “হে আমার রব, আমি তাড়াতাড়ি তোমার দিকে এসেছি যাতে তুমি সন্তুষ্ট হও।” (সুরা তাহা, আয়াত: ৮৪)

৩. নিজেকে আল্লাহর জন্য উৎসর্গ করা

আল্লাহ বলেন, “মানুষের মধ্যে এমন কেউ আছে যে আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনায় নিজেকে বিক্রি করে দেয়, আর আল্লাহ বান্দাদের প্রতি অত্যন্ত দয়ালু।” (সুরা বাকারা, আয়াত: ২০৭)

নিজেকে আল্লাহর জন্য উৎসর্গ করা মানে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তাঁর আনুগত্যকে অগ্রাধিকার দেওয়া। এর ফলে বান্দার জীবন সুখ ও শান্তিতে ভরে ওঠে। (মুহাম্মাদ রশিদ রিদা, *তাফসিরে মানার,* ২/১৭৭, দারুল ফিকর, কায়রো, ২০১০)

৪. নেতিবাচক গুণাবলি পরিহার

ইসা ইবনে মারিয়াম (আ.)-কে ইয়াহিয়া ইবনে যাকারিয়া (আ.) জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "কীভাবে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা যায় এবং তাঁর অসন্তুষ্টি থেকে দূরে থাকা যায়?" ইসা (আ.) বললেন, "রাগ করো না।" তিনি আরও বললেন, রাগের উৎস হলো অহংকার, আত্মম্ভরিতা ও বড়াই। (ইবনে ওয়াহহাব, *আল-জামি,* পৃ. ৯৮, দারুল কুতুব, দামেস্ক, ২০১৭)

৫. সাধারণ নেয়ামতের শুকরিয়া

রাসুল (সা.) বলেছেন, "আল্লাহ তাঁর বান্দার প্রতি সন্তুষ্ট হন যখন সে খাবার খায় এবং তার জন্য আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করে, অথবা এক ঢোক পানি পান করে এবং তার জন্য আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করে।" (সহিহ মুসলিম, হাদিস: ২৭৩৪) এই হাদিস থেকে বোঝা যায়, ছোট ছোট নেয়ামতের শুকরিয়া আদায় করাও আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের একটি মাধ্যম।

৬. অল্পে সন্তুষ্ট থাকা

মালিক ইবনে দিনার ও মুহাম্মাদ ইবনে ওয়াসি জীবনযাত্রা নিয়ে আলোচনা করছিলেন। মালিক বললেন, "একজন মানুষের জন্য সবচেয়ে ভালো হলো তার জন্য যথেষ্ট আয় থাকা।" মুহাম্মাদ বললেন, "ধন্য সেই ব্যক্তি, যে দুপুরের খাবার পায় কিন্তু রাতের খাবার পায় না, অথবা রাতের খাবার পায় কিন্তু দুপুরের খাবার পায় না, তবুও সে আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট থাকে।" (ইবনে আবিদ দুনিয়া, *আর-রিদা আন আল্লাহ বিকাদায়িহি,* পৃ. ৫৫, দারুল বাশাইর, মদিনা, ২০১৯)

এটি দারিদ্র্যের প্রশংসা নয়, বরং অল্পে সন্তুষ্ট থাকার মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের আহ্বান।

৭. হালাল উপার্জন করা

একটি হাদিসে বলা হয়েছে, "যে ব্যক্তি হালাল উপার্জনের জন্য ক্লান্ত হয়ে রাত্রি যাপন করে, আল্লাহ তার প্রতি সন্তুষ্ট থাকেন।" (ইবনে আবিদ দুনিয়া, *ইসলাহুল মাল*, পৃ. ৭৮, দারুল কুতুব, কায়রো, ২০১৮)

৮. পিতামাতার সন্তুষ্টি

রাসুল (সা.) বলেছেন, "আল্লাহর সন্তুষ্টি পিতামাতার সন্তুষ্টির মধ্যে রয়েছে, আর আল্লাহর অসন্তুষ্টি রয়েছে পিতামাতার অসন্তুষ্টির মধ্যে।" (বায়হাকি, *শু'আবুল ঈমান*, হাদিস: ৭৪৬৭)

পিতামাতার দোয়া ও সন্তুষ্টি আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

৯. তকদিরের প্রতি সন্তুষ্টি

তকদির বা আল্লাহর ভাগ্যলিপির প্রতি সন্তুষ্ট থাকা দুনিয়ার শান্তি ও সুখের একটি বড় কারণ। কোরআনে খিজির (আ.)-এর ঘটনার উদাহরণে দেখা যায়, আল্লাহ একটি শিশুকে হত্যা করার নির্দেশ দিয়েছিলেন যাতে তার পিতামাতা তার অবাধ্যতা ও কুফরের কষ্ট থেকে রক্ষা পান। (সুরা কাহফ, আয়াত: ৮০-৮১)

ধন্য সেই ব্যক্তি, যে দুপুরের খাবার পায় কিন্তু রাতের খাবার পায় না, অথবা রাতের খাবার পায় কিন্তু দুপুরের খাবার পায় না, তবুও সে আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট থাকে।

পরিসমাপ্তি

আল্লাহর কাছে মানুষের জন্য একটিমাত্র জীবনব্যবস্থাই রয়েছে, তা হলো **ইসলাম।** মানুষ আল্লাহকে তার একমাত্র মালিক ও উপাস্য হিসেবে স্বীকার করবে আরো মানবে হযরত মুহাম্মদ সা: আল্লাহর প্রেরিত রাসুল- এভাবে তাঁর সামনে সম্পুর্নরূপে আত্মসমর্পণ করবে।

আর তাঁর ইবাদতের পদ্ধতি নিজেরা আবিস্কার করবে না বরং তিনি নবীর সা: এর মাধ্যমে যে হেদায়াত পাঠিয়েছেন তার ওপরেই হুবুহু কায়েম থাকবে। এ চিন্তা ও কর্মপদ্ধতির নামই হচ্ছে **ইসলাম।**

আল্লাহর বলেছেন, " নিশ্চয়ই আল্লাহর কাছে মনোনিত জীবন-বিধান হলো ইসলাম"- (সুরাহ আলে ইমরান : আয়াত ১৯)

সুরাহ মায়েদার ৩ নং আয়াতে আল্লাহ রব্বুল ইজ্জত বলেছেন-

اَلۡیَوۡمَ یَئِسَ الَّذِیۡنَ کَفَرُوۡا مِنۡ دِیۡنِکُمۡ فَلَا تَخۡشَوۡہُمۡ وَ اخۡشَوۡنِ ؕ اَلۡیَوۡمَ اَکۡمَلۡتُ لَکُمۡ دِیۡنَکُمۡ وَ اَتۡمَمۡتُ عَلَیۡکُمۡ نِعۡمَتِیۡ وَ رَضِیۡتُ لَکُمُ الۡاِسۡلَامَ دِیۡنًا ؕ

"আজ অবিশ্বাসীগণ তোমাদের ধর্মের বিরুদ্ধাচরণে হতাশ হয়েছে। সুতরাং তাদেরকে ভয় করো না, শুধু আমাকে ভয় কর। আজ তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্ম (ইসলাম) পূর্ণাঙ্গ করলাম ও তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের ধর্ম হিসাবে মনোনীত করলাম।"

আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ, রহমানির রহীম আমাদেরকে ইসলামের জন্য মনোনিত করেছেন।

আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন একটি জীবনব্যাপী সাধনা।এটি শুধুমাত্র বড় আমলের মাধ্যমে নয় বরং খালেস নিয়তে ছোট ছোট আমলের দ্বারাও অর্জন করা যায়। **এই পথে চলার মাধ্যমে বান্দা দুনিয়া ও আখেরাতে শান্তি, সুখ ও সাফল্য লাভ করতে পারে। আল্লাহ রব্বুল আ'লামিন আমাদের খাস নিয়ত পূরন করুন এবং কবুলান মঞ্জুর করুন। আমি-ন।**

তথ্যসূত্র

(বিষয়ভিত্তিক) তাফসীরুল কুরআন বিল কুরআন

- শাইখ আবদুর রহমান বিন মুবারক আলী

সংক্ষিপ্ত তাফসীরে উসমানী

- মাওলানা গিয়াসউদ্দিন আহমদ

কুরআন মাজীদ (বাংলা) - এ্যাপ

মুসলিম জীবনে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উপায়

-মনযরুল হক

সুখী হওয়ার উপায় - I O U (মূল আর্টিকেল)

- অনুবাদক- আম্মাতে রব্বানী- মুসলিম মিডিয়া প্রতিনিধি

লা তাহযান - ড: আইদ আল করনী

প্রখ্যাত আরব গবেষক ও দাঈ

সুখের সন্ধানে

- আবদুল হামিদ মাদানী